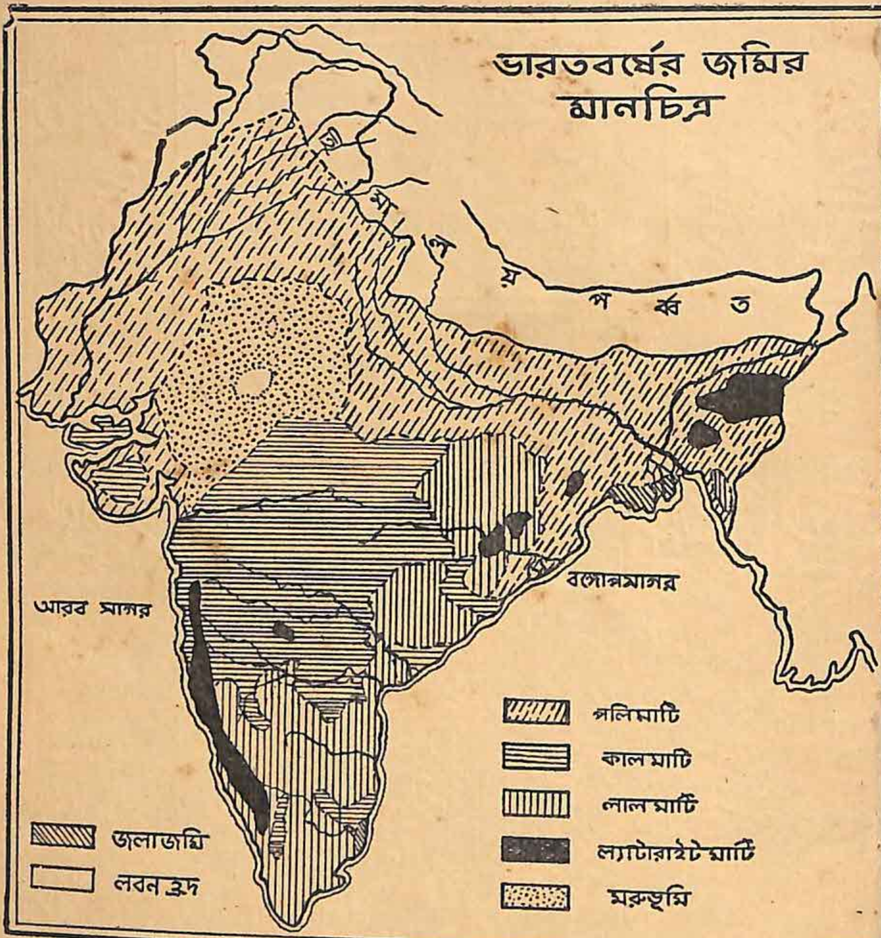
জমি ও চাষ

শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ



ভারতবর্ষের জমির মানচিত্র
হি মা ল য় প র্ব্ব ত
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
পলিমাটি
কালমাটি
লালমাটি
ল্যাটারাইট মাটি
মরুভূমি
জলাজমি
লবন হ্রদ

জমি ও চাষ

শ্রীসত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ ১ চৈত্র ১৩৫০
পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৫২

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

২১'০—৩০, ১১. ৪৫

কৃষি-বিজ্ঞানের উৎপত্তি

আদিম যুগে মানুষ ইতর প্রাণীর মতোই বনের ফলমূল এবং কাঁচা মাংস খাইয়া জীবনঃধারণ করিত। ক্রমে বংশবৃদ্ধির ফলে আহার্যের অনটন ঘটায় আদিম মানব নিজ পরিবার লইয়া যাযাবর অবস্থায় বহুদূরবর্তী স্থানে গমন ও অবস্থিতি করিয়া জমিতে শস্যোৎপাদন করিতে বাধ্য হয়। প্রথম অবস্থায় তাহারা অগ্নি-সংযোগে বনজঙ্গল দগ্ধ করিয়া ঐ সকল জমিতে কর্ষণ ব্যতীতই শস্যোৎপাদন করিত। এই প্রকারেই আদিম কৃষিকার্যের সূত্রপাত। আদিম কালে জনসংখ্যা বেশি ছিল না, তখন একই জমিতে বার বার শস্যোৎপাদন করার চিন্তা মানুষের মনে জাগে নাই,—কারণ তখনকার দিনে চাষের জন্য স্বত্বহীন অরণ্যের অভাব ছিল না। কিন্তু জনসংখ্যার বিস্তার ও রাজশক্তি বিকাশের সহিত একই জমিতে বার বার ফসল উৎপাদন করা আবশ্যক হইল। কর্ষণ ও সারপ্রয়োগ দ্বারা জমির উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা এইভাবেই আরম্ভ হয়।

মহেন্-জো-দাড়ো প্রদেশে পুরাবৃত্ত উদ্ধারকল্পে যে খননকার্য হইয়াছে তাহা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বৈদিক যুগের বহুপূর্ব হইতেই (খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০ বৎসর) ভারতবর্ষে কৃষিকার্যের প্রচলন ছিল। মহেন্-জো-দাড়ো সিন্ধুপ্রদেশে লার্কানা জেলায় অবস্থিত। সে সময়ে ভারতবর্ষে আর্যগণের আগমন হয় নাই। সেই প্রাচীনকালে সিন্ধুপ্রদেশে যে সকল রকমের গম ও যব উৎপন্ন করা হইত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, বিস্ময়ের বিষয় যে, আজকালও পাঞ্জাব প্রদেশে সেই সকল প্রকার গম ও যবই উৎপন্ন হয়। মহেন্-জো-দাড়োর খনন হইতে গো, অশ্ব, মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুর কঙ্কালের অবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০ বৎসর পূর্বেও ভারতবর্ষে উক্ত পশু প্রতিপালন

করা হইত। বৈদিক যুগ সাধারণত খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ বৎসর হইতে গণনা করা হয়। ঋগ্‌বেদ, অথর্ববেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে বৈদিক যুগের পশুপালন, ভূমিকর্ষণ, শস্যপর্যায় প্রভৃতি কৃষিপদ্ধতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগের (খ্রীস্টপূর্ব ৬০০ বৎসর) জাতক গ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অনুসারে অনুষ্ঠিত ভূমিকর্ষণ, জলসেচন প্রভৃতি কৃষিকার্যের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। ইহা ভিন্ন মহাভারত, মনু, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেও প্রাচীন ভারতের কৃষি-প্রণালীর ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্যদেশে গ্রীক-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-বিজ্ঞানের উন্নতির আরম্ভ হইয়াছিল। খ্রীস্টপূর্ব ৪০ অব্দে লিখিত ভার্জিলের 'জর্জিক সার্কা' (Gergic Circa) নামক গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে, মৃত্তিকা খনন করার পরে সেই মাটি দ্বারাই গর্ত চাপা দিয়া উদ্ভিদাদি উৎপন্ন করা হইত। উক্ত গ্রন্থে ইহাও বলা আছে যে, এই পদ্ধতির প্রকৃত উদ্দেশ্য মাটিকে আল্‌গা করিয়া উহার শস্যোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা। রোম-সাম্রাজ্যের সভ্যতার সময়ে কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক বই লেখা হইয়াছিল। তাহা হইতে সেকালের কৃষিপদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য জানা যায়। ১২৪০খ্রীস্টাব্দে পেট্রুস্ ক্রেসেন্‌সিউস্ (Petrus Crescentius) নামক জনৈক পণ্ডিত রোমীয় সভ্যতার যুগের কৃষি-সাহিত্যকে একত্র করিয়া De Agricultura Vulgare নামে একটি পুস্তক সংকলন করেন। এযাবৎ এই গ্রন্থখানির বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহা সুখপাঠ্য কৃষিবিজ্ঞান বলিয়া আদৃত হইয়া আসিয়াছে। ইহার পরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই, বিশেষত ইটালী ও ফ্রান্সে কৃষিবিজ্ঞানের বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বিশেষজ্ঞেরা পরীক্ষা দ্বারা উদ্ভিদের সৃষ্টি ও জমির উর্বরতার মূল তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। প্রসিদ্ধ মনীষী ফ্রান্সিস বেকন (১৬২৭ খ্রীস্টাব্দ) বিশ্বাস করিতেন যে, জলই উদ্ভিদের প্রধান পুষ্টিসাধক। তাঁহার মতে

জমির প্রধান কাজ উদ্ভিদকে দণ্ডায়মান রাখা এবং তাহাদিগকে অত্যধিক শৈত্য অথবা উত্তাপ হইতে রক্ষা করা। ফ্রান্সিস বেকন আরও বিশ্বাস করিতেন যে, প্রত্যেক উদ্ভিদ জীবনধারণের জন্য জমি হইতে একটি বিশিষ্ট রস টানিয়া লয়। এই সময়েই ভ্যান হেল্‌মণ্ট (Van Helmont) উদ্ভিদের পুষ্টি সম্বন্ধে একটি পরীক্ষার ফলে স্থির করেন যে, জলই উদ্ভিদের পুষ্টিসাধনের একমাত্র কারণ। তাঁহার পরীক্ষাটি মোটামুটি এইরূপ—একটি বড়ো মাটির পাত্রকে আড়াই মন মাটি দিয়া ভর্তি করিয়া উনানে গরম করা হয়। ঐ মাটি বৃষ্টির জল দ্বারা ভিজাইবার পরে আড়াই সের ওজনের উইলো গাছের একটি ছোটো চারা উহার মধ্যে রোপণ করা হয়। মাটির মধ্যে বৃষ্টির জল অথবা পরিস্রুত জল ছাড়া আর কিছুই দেওয়া হয় নাই, এবং বহু ছিদ্রযুক্ত ও টিন-আবৃত লৌহপাত দিয়া মাটিকে ভালোভাবে ঢাকিয়া রাখা হইয়াছিল, যাহাতে বাহিরের ধুলা পরীক্ষার মাটির সহিত মিশিতে না পারে। ঠিক পাঁচ বৎসর পরে ভ্যান হেল্‌মণ্ট দেখিলেন যে, গাছটির ওজন দুই মনের অধিক হইয়াছে। পরে ঐ মাটিকে উনানের উত্তাপে শুষ্ক করা হয় এবং দেখা যায় যে উহার ওজন মাত্র এক ছটাক কমিয়াছে। এই পরীক্ষার ফলে ভ্যান হেল্‌মণ্ট স্থির করেন যে, জল হইতে উইলো গাছের প্রায় দুই মন কাঠ, গাছের ছাল ও মূলের উৎপত্তি হইয়াছে। ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দে বয়েল একইরূপ পরীক্ষার ফলে ভ্যান হেল্‌মণ্টের মত সমর্থন করেন। কিন্তু ইহারা দুইটি বিষয়ের কথা চিন্তা করেন নাই। প্রথমত, এক ছটাক মাটি কী প্রকারে অন্তর্হিত হইল। তাঁহারা সম্ভবত আড়াই মন মাটির মাত্র এই ছটাক ওজনের হ্রাস উপেক্ষা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, উদ্ভিদের পুষ্টিসাধনে বায়ুমণ্ডল কী ভাবে সহায়তা করে তাহাও তাঁহাদের জানা ছিল না। বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এইরূপ ভুলের উদাহরণ অনেক আছে।

১৭৪১ খ্রীস্টাব্দে কুইল্‌বেল (Kulbel) একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, ইহা পাঠে জানা যায়, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, উদ্ভিদজাতীয় পদার্থ অথবা

পাতাসার (humus) জমির উর্বরতার প্রধান কারণ। ১৭৩১ খ্রীস্টাব্দে জেথ্রো টাল (Jethro Tull) নামে জনৈক কৃষক অশ্বপরিচালিত বীজবপন-যন্ত্র ও আগাছা তুলিবার যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া কৃষিকার্যের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। টালের মতে উদ্ভিদের পুষ্টিসাধন ও গঠনকার্যে জমির উৎপাদিকাশক্তি বিশেষভাবে সহায়তা করে। টাল বলিয়াছিলেন যে, জমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি বাড়ন্ত শিকড়ের স্ফীতির ফলে রসপ্রবাহক ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়া যায় এবং পরে উদ্ভিদের রসাবর্তক প্রণালীর ভিতরে প্রবেশ করে। টালের মতে যদি উত্তাপের মাত্রা ঠিক থাকে এবং জমির উপরে জলের সরবরাহ যথাবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে যে-কোনো জমি যে-কোনো প্রকার গাছের পুষ্টিসাধন করিতে পারে।

১৭৫০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের কৃষিজগতে তত্তেজঃ সম্বন্ধীয় যুগ (The Phlogistic Period) বলিয়া ধরা হয়। এই সময়ে ইংলণ্ডের এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশেরই দরিদ্র কৃষকশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া ডিউক প্রভৃতি অভিজাত সম্প্রদায় পর্যন্ত কৃষিকার্যের উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করেন। সর্বশ্রেণীর কর্মিগণের সমবেত চেষ্টায়, বহু আয়াসসাধ্য পরীক্ষার ফলে, কৃষি-বিজ্ঞানের বহু মূলতত্ত্ব ও জ্ঞাতব্য বিষয় আবিষ্কৃত হয়। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সিস হোম কৃষিকার্যের নিয়মাবলী কী প্রকারে রসায়নশাস্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা জানিতে মনোনিবেশ করেন। এই প্রসঙ্গে ফ্রান্সিস হোম বলেন যে, উদ্ভিদের খাদ্য কয়েকটি উপাদান লইয়া গঠিত ; যথা, বায়ু, জল, মাটি, বিভিন্ন প্রকারের লবণ, তৈল এবং অগ্নি। ফ্রান্সিস হোমের পরীক্ষা-প্রতিপন্ন সুচিন্তিত অভিমতগুলি কৃষি-বিজ্ঞানকে অনেকটা উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছিল। এই সময় হইতেই ছোটো ছোটো পাত্রের মধ্যে মাটি রাখিয়া উদ্ভিদাদি উৎপন্ন করা হইত। রাসায়নিক পরীক্ষাগারে উদ্ভিদকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার উপাদান নির্ণয় করা এই সময় হইতেই আরম্ভ হয়।

১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে প্রিস্টলী কৃষি-বিজ্ঞানকে আরও এক ধাপ আগাইয়া দিলেন।

তাঁহার চিন্তার ধারা এইরূপ— জীবজন্তুর নিশ্বাসপ্রশ্বাস, দহনকার্য এবং নানাবিধ পদার্থের পচনকার্যের জন্য বায়ুমণ্ডল অনবরত কলুষিত হইতেছে—সুতরাং অবশ্যই কোনও প্রকার প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বায়ুমণ্ডলকে পরিশুদ্ধ করিতেছে বুঝিতে হইবে। কারণ তাহা না হইলে বায়ুমণ্ডল ক্রমে ক্রমে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া ও দহনকার্যের পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়া পড়িত এবং জীবজন্তু যুগযুগান্তরক্রমে বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না। এই প্রসঙ্গে প্রিস্টলী পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে, উদ্ভিদকে যদি কলুষিত বায়ুর মধ্যে জন্মানো যায়, তাহা হইলে ক্রমে উক্ত দূষিত বায়ু পরিশুদ্ধ হইয়া পুনরায় মানুষের নিশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের অথবা দহনকার্যের উপযোগী হয়। প্রিস্টলী তখনও পর্যন্ত অক্সিজেন আবিষ্কার করেন নাই। কাজেই সেই সময়ে তিনি উপরোক্ত আবিষ্কারের মূলতত্ত্ব বিষয়ে যথার্থ অভিমত জ্ঞাপন করিতে পারেন নাই। ইহার কিছুকাল পরে প্রিস্টলী অক্সিজেন আবিষ্কার করেন এবং অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয় করিবার জন্য উপযুক্ত প্রণালীও উদ্ভাবন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশত তিনি তাঁহার পূর্বের পরীক্ষার ফল প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। কারণ উপরোক্ত প্রক্রিয়াতে যে সূর্যালোকের কোনও প্রভাব থাকিতে পারে, সে সম্বন্ধে তাঁহার কোনও ধারণা ছিল না। এই সময়ে তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিত শীলে (Scheele) এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, জীবজন্তুর মতোই উদ্ভিদাদির নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা বায়ুমণ্ডল কলুষিত হয়। পরবর্তী পরীক্ষা ব্যর্থ হওয়াতে প্রিস্টলী তখন শীলের অভিমতের কোনও উত্তর দিতে পারেন নাই। ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে ইন্‌গেন হাউজ (Ingen Howz) উপরোক্ত দুইটি বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য সাধন করেন। তিনি দেখাইলেন যে আলোকের সাহায্যে উদ্ভিদ দূষিত বায়ুকে পরিশুদ্ধ করে, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে উদ্ভিদকে রাখিলে বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে।

১৮০০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কৃষি-বিজ্ঞানের আধুনিক যুগ বলিয়া পরিগণিত। জেনেভা-নিবাসী পণ্ডিত থিয়োডোর দ্য সওস্যুরে (Theodore de Saussure)-কে উদ্ভিদের শারীরবিদ্যা এবং বর্তমান কৃষি-রসায়ন-শাস্ত্রের

সৃষ্টিকর্তা বলা যাইতে পারে। তিনি যে সকল পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল পরীক্ষার ভিত্তিতেই আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে। ত্য সওস্যুরে বায়ুর মধ্যে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে অঙ্গারবাষ্পমিশ্রিত বায়ুর মধ্যে উদ্ভিদ জন্মাইয়া উক্ত মিশ্রিত বায়ুর উপাদানের যে সকল পরিবর্তন ঘটে, তাহা অতি যত্ন সহকারে নির্ণয় করেন। এই সকল পরীক্ষার সাহায্যে ত্য সওস্যুরে দেখাইলেন যে শ্বাসের জন্য উদ্ভিদেরা বায়ুমণ্ডল হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং প্রশ্বাসের সহিত কার্বন ডায়ক্সাইড পরিত্যাগ করে। তিনি আরও দেখাইলেন যে, প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদেরও এই শ্বাসকার্য দিবারাত্র চলিতেছে। ত্য সওস্যুরে প্রতিপন্ন করেন যে, উদ্ভিদ দিবাভাগে সূর্যকিরণের সাহায্যে পত্রচ্ছিদ্র-পথে কার্বন ডায়ক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। এই কার্য উদ্ভিদের শ্বাস-প্রশ্বাসকার্যের ঠিক বিপরীত। অন্ধকারে এই অঙ্গার-সমীকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে।

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে সার্ হাম্‌ফ্রে ডেভী কৃষি রসায়নের একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮০২ হইতে ১৮১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রয়াল ইন্‌স্টিটিউশনে যে সকল বক্তৃতা করেন সেগুলি অবলম্বন করিয়াই ঐ গ্রন্থ সংকলন করেন এবং তাহাতে তদানীন্তন কৃষি-রসায়নের তত্ত্বগুলি সরল বৈজ্ঞানিক ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। বৈজ্ঞানিক জগতে তখন ডেভীর যশ ও খ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। তৎকালীন কৃষি-বিশারদ পণ্ডিতগণ নির্বিবাদে কৃষি-রসায়ন সম্বন্ধে ডেভীর সকল সিদ্ধান্তই মানিয়া লইয়াছিলেন— যদিও আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে ডেভীর সিদ্ধান্তগুলি অভ্রান্ত নহে। ত্য সওস্যুরে অঙ্গার সমীকরণ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ডেভী তাহা মানিয়া লইতে পারেন নাই। ডেভীর মতে কোনও কোনও উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলস্থ অঙ্গারাম্ল হইতে অঙ্গার গ্রহণ করিতে পারিলেও সাধারণত শিকড়ের সাহায্যেই উদ্ভিদ মাটির মধ্য হইতে এই বস্তু পায়। উদ্ভিদের পুষ্টিকারক সার সম্বন্ধে ডেভীর কতকগুলি অভিমত লিখিত হইল :

১. তৈলাক্ত পদার্থ জমির উৎপাদিকাশক্তি বর্ধিত করিতে বিশেষ উপযোগী —তাহার প্রধান কারণ তৈলের মধ্যে অঙ্গার ও হাইড্রোজেন আছে।

২. ঝুলের পুষ্টিদানের ক্ষমতা খুব বেশি— কারণ উহার মধ্যে অঙ্গার এরূপ অবস্থাতে আছে যে তাহা অতি সহজেই অক্সিজেন ও জলের সংস্পর্শে দ্রবণীয় হয়।

৩. চুন অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ, কারণ ইহা সহজেই কঠিন উদ্ভিদ-জাতীয় পদার্থকে দ্রবীভূত করিয়া ফেলে।

৪. টাট্‌কা মূত্র অপেক্ষা পচা মূত্র সার হিসাবে অনেক কম উপকারী।

বলা বাহুল্য উপরোক্ত অভিমতগুলির অধিকাংশই আজকালকার দিনে কেহ পোষণ করেন না। ডেভীর সুপ্রতিষ্ঠিত নামের সহিত সংযুক্ত ছিল বলিয়াই ঐ সকল মত পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন না হইলেও অনেকদিন টিঁকিয়া ছিল।

এই প্রসঙ্গে মার্কিন কৃষিবিশারদ এডমণ্ড রাফিনের (১৭৯৪-১৮৬৪ খ্রীঃ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জমির উর্বরতার উপরে চুনের প্রভাব নির্ধারণ রাফিনেরই প্রথম আবিষ্কার। রাফিন পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, যে সকল জমিতে খনিজ পদার্থের আধিক্য আছে, সেই সকল জমিতে অম্লের পরিমাণ বেশি এবং চুনের পরিমাণ কম। আবার ঐ সকল জমির উর্বরতাও অপেক্ষাকৃত অল্প। এখানে বলা যাইতে পারে যে, শস্য উৎপাদন করিবার জন্য জমিতে চুন প্রয়োগ করিবার পদ্ধতি বহুপুরাকাল হইতে প্রচলিত ছিল। ডেভী প্রমুখ ইংরেজ লেখকগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, জমিতে চুন দিবার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে জমির প্রাকৃতিক সংস্থাপন (texture) উন্নত করা। লিবিগের মতে জমিতে চুন প্রয়োগ করিলে বালুকাত্মক পদার্থ হইতে ক্ষার ও বালুকা বিশ্লিষ্ট হয় বলিয়া চাষের উপকার হয়। কিন্তু অম্লভাগ দূরীভূত করাই যে চুনের প্রধান ক্রিয়া তাহা সর্বপ্রথমে রাফিনই প্রতিপন্ন করেন।

১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্বভাগ পর্যন্ত কৃষি-বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলি ল্যাবরেটরীতে অথবা ছোটো ছোটো পাত্রের মধ্যে সম্পন্ন করা হইত। ১৮৩৪

খ্রীস্টাব্দে স্বনামধন্য কৃষিবিশারদ বসিনল্ (Boussingault) দক্ষিণ-আমেরিকার অন্তর্গত আলসাক্ (Alsace) প্রদেশে বেকেলব্রোন্ (Bechelbronn) নামক স্থানে তাঁহার কৃষিক্ষেত্রে কতকগুলি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতেই আধুনিক পরীক্ষামূলক কৃষি-বিজ্ঞানের উৎপত্তি, এবং বসিনলই ইহার প্রতিষ্ঠাতা।

১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে লওয়েস (Lawes) ও গিলবার্ট (Gilbert) রথাম-স্টেডের বিখ্যাত কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ পরীক্ষাগুলি আরম্ভ করেন। এই পরীক্ষাগুলি এ যাবৎ একই ক্ষেত্রে বৎসরের পর বৎসর সম্পন্ন করা হইতেছে এবং ইহা হইতে কৃষি-প্রণালী বিষয়ে বহু সারগর্ভ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে। লওয়েসই সর্বপ্রথম তাঁহার পরীক্ষা দ্বারা কৃত্রিম অজৈব সারের উপকারিতা প্রতিপন্ন করেন। রথাম্‌স্টেডের কৃষিক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রমাণিত হয় যে, কৃত্রিম সারের প্রয়োগে জমির উৎপাদিকাশক্তি অন্তত কয়েক বৎসর পর্যন্ত রক্ষা করা যাইতে পারে। কৃষি-বিজ্ঞানে এই অভিজ্ঞতা এক নূতন যুগ আনিয়াছে বলা যায়।

কৃষিকার্যে যন্ত্রের ব্যবহার

মানবসভ্যতার প্রথম যুগে কৃষিকার্যে যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হইত বর্তমানে তাহার বহু উন্নতি হইয়াছে। সেই সকল পুরাতন যন্ত্র আজকাল সাধারণত জাদুঘরে দেখানো হয়। কৃষিকার্যের একটি আদিম যন্ত্র হইতেছে খনন-যষ্টি। এই খনন-যষ্টির সাহায্যে সহজেই জমির ভিতর হইতে বৃক্ষের শিকড় উৎপাটন করা যায়। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিগণ এখনও এই প্রকার যষ্টি ব্যবহার করিয়া থাকে। ফিজি ও দক্ষিণ-আফ্রিকার আদিম অধিবাসিগণও ঝোপ ও উইয়ের ঢিপি পরিষ্কার করিবার জন্য ইহার ব্যবহার করে। এখনও "ঝুমিয়া" চাষ ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পাহাড়-অঞ্চলে বর্তমান দেখা যায়। খনন-যষ্টির পরের অবস্থা হইতেছে

কোদাল। পৃথিবীর অনেক জায়গায় আদিম অধিবাসিগণ কোদালকে মৃত্তিকাখনন এবং কৃষিকার্যে কর্ষণযন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। সভ্যজগতে কৃষিকার্যে উহা কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। তবে বাগান চাষ করিবার পক্ষে কোদাল খুব সুবিধাজনক যন্ত্র।

বিজ্ঞানের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে জমি চাষ করিবার জন্য ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী যন্ত্রের আবিষ্কার হইতেছে। অবশ্য এই সকল যন্ত্র পৃথিবীর সর্বত্রই সমভাবে ব্যবহৃত হইতেছে না। ভারতবর্ষে চাষীরা বলদের সাহায্যে লাঙল চালনা করিয়া জমিতে চাষ দেয়। ইউরোপে এবং অস্ট্রেলিয়ার অনেক জায়গায় ঘোড়ার দ্বারা লাঙল পরিচালনা করা হয়। কানাডা, আমেরিকা এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশে আজকাল এঞ্জিন-চালিত মোটর-লাঙল অথবা ট্রাক্টর দ্বারা জমি চাষ করা হয়।

লাঙলের সাহায্যে জমি কর্ষিত হইবার পর জমির ঢেলাগুলি ভাঙিয়া উঁচুনিচু স্থানগুলি সমতল করিয়া দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে সাধারণত মই অথবা বিদের সাহায্যে ইহা করা হয়। এই সকল যন্ত্র বলদের দ্বারা পরিচালিত এবং বলা বাহুল্য বিশেষ আয়াসসাধ্য, যদিও ছোটো ছোটো ক্ষেত্রের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। কানাডাতে সুবৃহৎ দীর্ঘতৃণাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ প্রান্তর ব্যাপিয়া গমের চাষ করা হয় এবং এঞ্জিন-পরিচালিত বিপুল শক্তিশালী মোটর-লাঙলের দ্বারা একসঙ্গে কর্ষণ এবং জমির ঢেলা ভাঙিয়া সমতল করা হয়। এই সকল মোটর-লাঙলের সহিত অনেকগুলি ধাতুনির্মিত ধারাল দাঁত সংযুক্ত থাকে এবং তাহারা ঢেলাগুলিকে ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড করে।

আধুনিক কৃষি-যন্ত্রগুলিকে আট ভাগে বিভক্ত করা যায়—

১. জমিকর্ষণ যন্ত্র—যথা, লাঙল, মোটর-লাঙল, হ্যারো, রোলার ইত্যাদি।

২. বীজবপন যন্ত্র—যথা, ড্রিল্।

৩. আগাছা উৎপাটন করা ও মাটিকে আল্‌গা করিয়া দিবার যন্ত্র—যথা 'হো'।

৪. শস্যচ্ছেদন যন্ত্র।

৫. শস্যমর্দন যন্ত্র—ইহা উদ্ভিদ হইতে শস্যের দানাগুলিকে পৃথক এবং পরে ভিতরকার শস্যদানাকে উপরের আস্তরণ হইতে বিচ্ছিন্ন করে।

৬. শস্যদানাকে খাদ্যের উপযোগী করার যন্ত্র, যথা, আধুনিক গমের কল। ইহা দ্বারা গমকে পিষিয়া আটা প্রস্তুত করা হয়।

৭. দুগ্ধের ব্যবসায়ে ব্যবহৃত নানাবিধ আধুনিক যন্ত্র, যথা রিফ্রিজারেটর, ক্রীম অপারেটর, চীজপ্রেসার ইত্যাদি।

৮. আবশ্যক হইলে স্থান ও অবস্থা অনুযায়ী কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের যন্ত্র, যথা, ওয়াটার এলিভেটর, ড্রেনেজ পাম্প, ইত্যাদি।

এই সকল যন্ত্রাদি ব্যতীত কৃষিক্ষেত্রে শস্যাদি বহন করিবার জন্য উপযুক্ত বাহন ও রাস্তা নির্মাণ করিবার জন্য উপযুক্ত যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

কৃষিকার্যে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুবিধা এই যে, কৃষক জমির অবস্থা বুঝিয়া ইচ্ছা-মতো সময়ে যন্ত্রের চালনা করিতে পারে। বলা বাহুল্য যন্ত্রের সাহায্যে কৃষিকার্য খুব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয়—তিনজন কৃষক আধুনিক উন্নত যন্ত্রের দ্বারা প্রায় বিয়াল্লিশ জন কৃষকের সমান কাজ করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া নির্বিশেষ ভাবে কৃষিকার্যে ট্রাক্টর রোটারি টিলার এবং নানাবিধ শস্যসংগ্রাহক যন্ত্রের ব্যবহার বর্ধিত করিলে অদূরভবিষ্যতে বেকারের সংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়িয়া যাইবে। ভারতবর্ষের পক্ষে কৃষিকার্যে যন্ত্রবাহুল্যের বিরুদ্ধে এই যুক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কেননা, ভারতবর্ষে চাষের জন্য জমির আয়তনের তুলনায় কৃষক সম্প্রদায়ের সংখ্যা খুব বেশি। কিন্তু ইংলণ্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে, যেখানে চাষের জমির তুলনায় কৃষকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, সেই সকল দেশে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন যন্ত্রের ব্যবহার নিতান্ত আবশ্যক। এই সকল দেশে বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত অনেক প্রকারের কৃষি-যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। অবশ্য ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে যে সকল মোটর-লাঙল ব্যবহৃত হয়, তাহা ভারতবর্ষে

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে উপযোগী নহে। কারণ শীতপ্রধান দেশের মোটর-লাঙলের এঞ্জিনের উত্তাপ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সহজে শীতল হইবে না। তাহা ছাড়া আরও একটা ভাবিবার কথা আছে। এদেশে কৃষকদের ক্ষেত্রগুলির পরিমাণ সাধারণত খুব কম এবং সেই সকল ছোটো ছোটো ক্ষেত্রের পক্ষে মোটর-লাঙল আদৌ কার্যকরী নহে। উপরি-উক্ত প্রভূত শক্তিশালী কৃষি-যন্ত্রাদি কেন যে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয় নাই তাহার আরও একটা প্রধান কারণ হইতেছে, ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থা। ভারতবর্ষের ভূমি বিশেষ কঠিন নহে এবং এই সকল কোমল ভূমিতে চাষ করিবার জন্য শক্তিশালী কৃষি-যন্ত্রাদির অভাব ও আবশ্যকতা কখনও অনুভূত হয় নাই। দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষের কৃষকেরা "চাষা" বলিয়া সমাজের নিকটে অবনত হইয়া আছে। আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। জমিদারবর্গের নিকট হইতে তাহারা কৃষিকার্যের উন্নতি সাধনের জন্য কদাচিৎ কোনও সাহায্য পাইয়া থাকে।

কৃষি-যন্ত্রের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশেরই কর্তৃপক্ষীয়দের কতকগুলি বিষয় ভাবা উচিত :

১. যন্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধীয় ব্যাপার এবং অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে অধিকতর শক্তিশালী যন্ত্রের উদ্ভাবন।

২. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যক্ষেত্রের মালিকরা যাহাতে অল্প খরচে কৃষি-যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা এবং এই উদ্দেশ্যে যৌথ-ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা ও প্রচলন।

৩. কৃষক-সম্প্রদায়কে সাধারণভাবে যন্ত্রবিদ্যা শিখানো আবশ্যক।

৪. স্থান ও অবস্থা বিশেষে কৃষিকার্যের পদ্ধতি ও কৃষি-যন্ত্রের ব্যবহার শৃঙ্খলাবদ্ধ করা প্রয়োজন।

৫. দেশবিশেষে কৃষি-যন্ত্র ব্যবহার করিলে কী প্রকার সামাজিক পরিবর্তন হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা।

উপরি-উক্ত বিষয়গুলি লইয়া সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১. কৃষি-যন্ত্রের প্রসার ও উন্নতিসাধন—ইংলণ্ড, জার্মানি ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে অল্পব্যয়ে অধিকতর কার্যকারী কৃষি-যন্ত্রের উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা হইতেছে এবং এই প্রকারে কৃষি-যন্ত্রগুলি ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যক্ষম হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আজকাল অনেক জায়গায় কৃষিকার্যে ব্যবহৃত শকটাদির চাকাতে বায়ুপূর্ণ রবারের নল ব্যবহার করা হয়। জার্মানিতে কৃষি-যন্ত্র নির্মাণের জন্য উচ্চশ্রেণীর ইস্পাতের ব্যবহার বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছে।

জমিকর্ষণ,, শস্যবপন, শস্যকর্ষণ প্রভৃতি কৃষিকার্যের জন্য ট্রাক্টর, রোটারি টিলার প্রভৃতি যন্ত্রগুলির উন্নতি-সাধন বিভিন্ন উপায়ে করা সম্ভব। কোনও স্থলে একফালি লাঙলের বদলে তিন অথবা চারি ফালির লাঙল ব্যবহার করা প্রয়োজন। কখনও বা ভূমিকর্ষণ, শস্যবপন এবং সার-বিতরণ পর পর একই যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন করা হয়। অনেক সময়ে যন্ত্রের উপকারিতা বর্ধিত করিবার জন্য উহার গতিশক্তি বাড়াইয়া দেওয়া দরকার। শেষোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিলে যন্ত্রকে এরূপ উপাদানে নির্মাণ করা আবশ্যক, যাহাতে উহা ভূমিকর্ষণের উপযোগী বল ধারণ করিতে পারে। কারণ যে লাঙল ঘণ্টায় দুই মাইল জমির চাষে উত্তমরূপে সাহায্য করিতে পারে তাহার দ্বারা ঘণ্টায় চারি মাইল জমির চাষের জন্য চেষ্টা করিলে পূর্বের মতো সন্তোষজনকভাবে জমির চাষ হইবে না। এইরূপ স্থলে এঞ্জিনীয়রদিগের গবেষণা কৃষিকার্যে প্রভূত উপকারে আসিতে পারে।

২, কৃষি-যন্ত্রের প্রচলনের জন্য যৌথ ব্যবসায়ের উপকারিতা—অনেক সময়ে ছোটো ছোটো ক্ষেত্রের মালিকদিগের পক্ষে আধুনিক কৃষি-যন্ত্রাদি উপকারী হইলেও বহুব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এই সকল স্থানে ভালো বন্দোবস্ত থাকিলে একই যন্ত্রের সাহায্যে কয়েকজন কৃষক উপকৃত হইতে

পারে। এইজন্য যেখানে অনেক দরিদ্র কৃষক কাছাকাছি জায়গায় বসবাস করে সেখানে কৃষি-যন্ত্রের ব্যবহারের জন্য কোনো প্রকার যৌব ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা বিশেষ ফলপ্রদ হইবে। ভারতবর্ষের পক্ষে এই যুক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

৩. কৃষক সম্প্রদায়কে সাধারণ যন্ত্রবিদ্যা শিখানো আবশ্যক—যন্ত্রব্যবহারের একটি বিশেষ অসুবিধা এই যে, যদি হঠাৎ কোনো যন্ত্র বিকল হয় তাহা হইলে উহাকে পুনরায় কার্যোপযোগী করিবার জন্য উপযুক্ত কারিগরের প্রয়োজন কিন্তু কৃষকদিগের মধ্যে যদি যন্ত্রের গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকে তাহা হইলে অন্তত ছোটো ছোটো মেরামতি কাজ তাহারা নিজেরাই করিতে পারে। ইহার জন্য বড়ো বড়ো জমিদারিতে একটি করিয়া বিচক্ষণ কারিগর রাখা এবং গভর্মেণ্টের তরফ হইতে কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃষি-যন্ত্র-বিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তারের জন্য সম্পূর্ণ সুবিধা করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

৪. স্থান ও অবস্থা বিশেষে প্রচলিত কৃষিকার্যের পদ্ধতি ও কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার শৃঙ্খলাবদ্ধ করা দরকার—ক্ষেত্র আয়তনে ছোটো হইলে অনেক সময়ে ক্ষেত্রকর্ষণ, বীজবপন, শস্যচ্ছেদন প্রভৃতি কার্য কৃষক-পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এইরূপ স্থলে যন্ত্রের ব্যবহারে কৃষকের কোনো সুবিধার সম্ভাবনা নাই, কারণ যদিও ইহাতে কৃষক, কৃষক-পত্নী ও পরিবারভুক্ত অন্যান্য লোকের কায়িক পরিশ্রম কিছু লাঘব হইতে পারে, কৃষকের পক্ষে ইহা বিশেষ ব্যয়সাধ্য হইবে। তবে এইরূপ স্থলে যন্ত্র ব্যবহার করিয়া কৃষক যদি অনেক বেশি ফসল অথবা অল্প শ্রমে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শস্য উৎপন্ন করিতে পারে, তবেই যন্ত্র-ব্যবহার সমর্থন করা যায়। যেখানে জমিদারি বড়ো এবং কৃষিক্ষেত্রগুলি খুব প্রশস্ত, সেখানে কোনো প্রকার শস্যোৎপাদনের জন্য যন্ত্র ব্যবহার করিবার পূর্বে ঐ শস্য সম্বন্ধে নানাস্থানের ফলাফল বিশেষভাবে পরীক্ষা করা উচিত। অবশ্য কোনো প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে বিভিন্ন স্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শস্যবপনের সময় ও কৃষিকার্যের প্রণালী বিবেচনা করা আবশ্যক।

বলা বাহুল্য কৃষি-যন্ত্রের যথাযথ ব্যবহারের জন্য সকল দেশেই গভর্মেণ্টের সাহায্য প্রয়োজন। রাশিয়াতে বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে সমস্ত কৃষিকার্য সরকার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ইহার ফলে কৃষিকার্যে রাশিয়াতে নূতন যুগ আসিয়াছে। রাশিয়াতে অনেক জায়গায় আজকাল এরোপ্লেনের সাহায্যে বিস্তৃত উর্বর জমির উপরে বীজ বপন করা হয়।

৫. কৃষি-যন্ত্র ব্যবহারের সহিত সামাজিক সম্বন্ধ— অধিকাংশ স্থলেই কৃষকদিগের মধ্যে আধুনিক কৃষি-যন্ত্র ব্যবহারের প্রচলন না হওয়ার প্রধান কারণ কৃষকদিগের দারিদ্র্য। ভারতবর্ষ, হাঙ্গেরী প্রভৃতি অনেক দেশে কৃষিক্ষেত্রের আয়তনের তুলনায় কৃষিকর্মীদিগের সংখ্যা খুব বেশি। এই সকল দেশে সাধারণ কৃষিকার্যে আধুনিক কৃষি-যন্ত্রের অত্যধিক ব্যবহার আরম্ভ করিলে বেকারের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে, যাহা সামাজিক মঙ্গলের দিক হইতে আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে।

জলসেচন ও জলনিকাশের ব্যবস্থা

উদ্ভিদের উৎপত্তি ও পুষ্টিসাধনের জন্য জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে জল রক্ষা করা আবশ্যক। বিভিন্ন মৃত্তিকার ছিদ্রের প্রকৃতিবিশেষে জলধারণ শক্তিও বিভিন্ন। যে মৃত্তিকার দানা বড়ো—যেমন বেলেমাটি—তাহার ছিদ্রও তত বেশি বড়ো। এইরূপ মৃত্তিকার জলশোষণ-শক্তি অপেক্ষাকৃত বেশি, কিন্তু জলধারণ শক্তি অত্যন্ত কম। কারণ স্থূল ছিদ্রের ভিতর দিয়া জল অতি সহজেই উপরের স্তর হইতে নিচের স্তরে প্রবেশ করিতে পারে। পক্ষান্তরে, মৃত্তিকার দানাগুলি যদি খুব ছোটো হয়—যেমন এঁটেল মাটি—তবে তাহার জলধারণ করিবার শক্তি অপেক্ষাকৃত কম হয়, কিন্তু জলধারণ করিবার শক্তি খুব বেশি থাকে। তাহা ছাড়া মৃত্তিকায় সঞ্চিত জলের কতক অংশ বাষ্প হইয়া উপরে চলিয়া যায় এবং

এইজন্য অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ের মধ্যে বেলেমাটির মধ্যস্থিত জলরাশি নিঃশেষিত হয়। কিন্তু এঁটেল মাটির ছিদ্র ছোটো বলিয়া উহা হইতে বাষ্পের আকারে জলশোষণ অপেক্ষাকৃত সময়সাপেক্ষ।

মৃত্তিকার মধ্যস্থিত জল কৈশিক আকর্ষণশক্তি (capillarity) দ্বারা উদ্ভিদের মূলের সন্নিকটে উপস্থিত হয় এবং উদ্ভিদ তাহা মূলদ্বারা নিজের আবশ্যকমতো গ্রহণ করে। এইরূপে গৃহীত জলরাশির কিয়দংশ উদ্ভিদের শরীর হইতে বাষ্পাকারে উদ্গত হয়। মৃত্তিকা ছোটো ছোটো দানাযুক্ত হইয়া চূর্ণিত অবস্থায় থাকিলে তাহার মধ্যে কৈশিক আকর্ষণশক্তি বিশেষ প্রবল থাকে এবং এইজন্যই কর্ষণের দ্বারা ক্ষেত্রের বড়ো বড়ো ঢেলাগুলিকে ছোটো ছোটো দানার আকারে পরিণত করিতে পারিলে উদ্ভিদ অতি সহজেই পুষ্টিলাভ করে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক উদ্ভিদ তাহার মূলের প্রসার অনুযায়ী মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তর হইতে জল আকর্ষণ করে।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে বোঝা যায় যে, উদ্ভিদের পুষ্টিসাধনের জন্য জমিতে যে পরিমাণে জলসেচন করা দরকার তাহা উদ্ভিদের এবং জমির প্রকৃতির উপরে নির্ভর করে। ক্ষেত্রে জল প্রয়োজনের চাইতে যতটা কম থাকিলে উদ্ভিদের মূল তাহা মৃত্তিকা হইতে শোষণ করিতে সমর্থ হয় না, তাহাকে উদ্ভিদের বিশীর্ণ--সীমা (wilting point) বলে। পক্ষান্তরে যে পরিমাণের অতিরিক্ত জল ক্ষেত্র ধারণ করিতে পারে না, তাহাকে ক্ষেত্র-জল (field capacity) বলা হয়। ক্ষেত্রসেচিত জলরাশি সকল সময়েই এই দুই পরিমাণের মধ্যে নির্ধারিত হওয়া দরকার। কারণ মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ জলের পরিমাণ বিশীর্ণ-সীমার কম হইলে উদ্ভিদের মূল তাহা গ্রহণ করিতে পারে না এবং ক্ষেত্র-জলের অধিক হইলে ঐ জলের কতকাংশ পয়ঃপ্রণালীযোগে ক্ষেত্র হইতে নিষ্কাশিত হইয়া যায় এবং কতকাংশ মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করে।

শস্যোৎপাদনের জন্য যে কী বিপুল পরিমাণ জল ব্যবহৃত হয় তাহা নিম্নের তালিকায় দেখানো হইল।

বিবিধ শস্য	এক মন শুষ্ক পদার্থ উৎপাদন করিতে কয় মন জলের প্রয়োজন
যব	৪৬৭
ভুট্টা	২৭১
মটরকলাই	৪৭৭

জমিতে জলসেচন করার সময়ে দেখা দরকার যাহাতে অনেকটা জল এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় দ্রুতবেগে না যায়। কারণ তাহাতে জলের স্রোতে জমির মূল্যবান্ সারপদার্থগুলি জমি হইতে বাহির হইয়া যায়। সেচনকালে জল এরূপ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়া দরকার যাহাতে নালার দুই পার্শ্বের ও তলার মাটি জলের সহিত প্রবাহিত না হয়, এবং নালার জল খুব পরিষ্কারভাবে প্রবাহিত হইতে পারে। তাহা ছাড়া জলসেচনের সময়ে জল যাহাতে ক্ষেত্রের সকল স্থানে সমানভাবে প্রবাহিত হইতে পারে এবং জমির কোথায়ও জমা হইয়া না থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার।

সাধারণত বৃষ্টির জল উদ্ভিদসমূহের জীবনধারণোপযোগী জল সরবরাহ করিয়া থাকে। প্রাচীন ভারতবর্ষের কৃষিকার্য মোটের উপর বৃষ্টির জলের উপরে নির্ভর করিত। এইজন্য প্রাচীন কালের কৃষি-গ্রন্থসমূহে প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে বৃষ্টির সময় ও বৃষ্টিবারির পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য বহুবিধ বিধি বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণত পৃথিবীর যে অঞ্চলে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়, সেই অঞ্চলে ফসলের প্রকৃতিও সেইরূপ হইয়া থাকে। নিম্ন-ব্রহ্মে গড়ে বার্ষিক ১২৩ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়; সেখানকার প্রধান ফসল ধান। রাজপুতানা ও সিন্ধুদেশে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১১ হইতে ৬ ইঞ্চির মধ্যে; সেখানকার প্রধান ফসল জোয়ার। পৃথিবীর যে সকল

অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম, সেই সকল অঞ্চলে বৃষ্টির জল যাহাতে শস্যের উপকারে আসিতে পারে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। মাটির জলীয় ভাগ সংরক্ষণ করার উপায় সম্বন্ধে পৃথিবীর নানাস্থানে প্রচুর গবেষণা হইতেছে। যে-অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম, সেখানে জল ধরিয়া রাখার শ্রেষ্ঠ উপায় জমি সমতল করা। বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জন্য অনেক স্থলে বাঁধ প্রস্তুত করিয়া বেশি পরিমাণ জমিতে জল সরবরাহ করা হয়। এই উপায়ে অনেক জায়গায় সুফল পাওয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে যে সাংকর্য বা অন্য কোনো পদ্ধতির সাহায্যে এমন শ্রেণীর উদ্ভিদের সৃষ্টি করা সম্ভব কি না, যাহাতে উদ্ভিদ নিতান্ত অল্প বৃষ্টিপাতের মধ্যেও বর্ধিত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, কোনো বিশেষ অবস্থার উপযোগী করিয়া উদ্ভিদের উৎপত্তি করা অসম্ভব নহে।

অনাবৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাইবার সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত উপায় হইতেছে জলাশয়, কূপ অথবা নালা খনন করিয়া জমিতে জল সরবরাহ করা। আকাশের জল অনেক সময়ে অনিশ্চিত হইলেও মাটির নিচের জল ও বড়ো বড়ো নদীর জল প্রায় সকল সময়েই সুনিশ্চিত। এই উপায়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে দরিদ্র কৃষকের ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। অনেক জায়গায় কূপ বা পুষ্করিণী হইতে জল তুলিবার জন্য বলদ অথবা এঞ্জিন পরিচালিত পার্সিয়ান হুইল (Persian wheel) ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে ১৫।১৬ হাত নিম্ন হইতে অনায়াসে জল উত্তোলন করা যাইতে পারে। একটি বড়ো চাকার উপরে কতকগুলি পাত্র জল পর্যন্ত ঝুলিতে থাকে এবং চাকা ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রগুলি জলপূর্ণ হইয়া উর্ধ্বমুখে চাকার গা বাহিয়া উপরে জল ঢালিয়া দিয়া নিম্নমুখে জলের নিচে চলিয়া যায়। জল তুলিবার জন্য আজকাল বহুবিধ নলকূপ এবং পাম্পও ব্যবহৃত হয়। জমিতে জল সরবরাহের জন্য নদীর উপরে বিশাল বাঁধ বাঁধা এবং সুদীর্ঘ খাল কাটা আধুনিক যুগে সম্ভব হইয়াছে।

কৃষিকার্যের জন্য আধুনিক জলরক্ষার প্রণালীগুলি আমেরিকায় সর্বপ্রথমে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বভাগ পর্যন্ত আমেরিকায় জলসেচন-প্রণালী বিশেষ প্রচলিত ছিল না। মেক্সিকো ও দক্ষিণ-আমেরিকার অধিবাসিগণ কোনো কোনো জায়গায় ছোটো ছোটো ক্ষেত্রে জলসেচন করিত। সেই সময়ে যে সকল ইউরোপীয় অধিবাসী আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমেরিকার যে সকল স্থানে অপেক্ষাকৃত বেশি বৃষ্টিপাত হইত, সেই সকল স্থানে অবস্থিতি করিতেন। কাজেই তাঁহারা প্রথমে জমিতে ফসল জন্মাইতে জলের অভাব বোধ করেন নাই। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে মর্মন ধর্মসম্প্রদায়ের বিখ্যাত নেতা ব্রাইহাম ইয়ং একদল উৎসাহী কর্মী লইয়া আমেরিকার সুদূর পশ্চিম অংশে গ্রেট্ সল্ট লেকের উপত্যকায় যে ভাগে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত অল্প তথায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহারা সেই বৎসরেই ঐ জায়গায় আলুর চাষ করেন এবং লাঙ্গলের সাহায্যে নালা কাটিয়া নিকটবর্তী শহরের খাল হইতে তাঁহাদের ক্ষেত্রে জল আনয়ন করেন। এই সময় হইতেই কৃষিকার্যে আমেরিকার আধুনিক জলসেচন প্রণালীর প্রসার আরম্ভ হইয়াছিল। আজকাল অনুর্বর স্থানে বহুদূরব্যাপী নালা কাটিয়া এবং স্থানে স্থানে জলরোধের জন্য বাঁধ বাঁধিয়া সহস্র সহস্র একর জমিতে উৎকৃষ্ট ফসল উৎপন্ন করা হইতেছে।

নদীতে বাঁধ বাঁধিবার পদ্ধতি খুব সাধারণ। জলসেচনের জন্য যতখানি জল আবশ্যক সেই অনুযায়ী নদীর জলের গতি রোধ করিবার জন্য নদীর মধ্যে নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত সুদৃঢ় দ্বার নামাইয়া দেওয়া হয়। স্রোতে বাধা পাইয়া নদীপৃষ্ঠ উপরে উঠিয়া আসে এবং বিশাল বাঁধের সাহায্যে নদীর সেই অতিরিক্ত জলরাশি রক্ষা করিবার পরে খালের সাহায্যে ইচ্ছামতো স্থানে প্রয়োজন অনুযায়ী জলসেচন করা সম্ভব হয়। কৃষক এইরূপ একটি প্রধান খাল হইতে তাহার চাষের জমিতে সারি সারি নালার মধ্য দিয়া আবশ্যকমতো জল চালনা

করিয়া লয়। ক্ষেত্রে যে জল সরবরাহ করা হয় তাহার পরিমাণ মাপিবার জন্য বহুবিধ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কৃষি-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সকল দেশেই জলসেচনের সাহায্যে কৃষিকার্যে নিযুক্ত জমির বিস্তৃতির জন্য প্রভূত চেষ্টা হইতেছে— কারণ পৃথিবীতে অনুর্বর জমির অন্ত নাই। অনেক জায়গায় উপযুক্ত জল পাইলে শস্য উৎপন্ন হইবার কোনোই বাধা থাকে না। ভারতবর্ষের সিন্ধুপ্রদেশের মরুভূমি ও পাঞ্জাবের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের সুবিস্তৃত জলসেচনের দ্বারা নানাবিধ শস্যোৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। সিন্ধুপ্রদেশের সুক্কুরের জলরোধের বাঁধ পৃথিবীর মধ্যে একটি সর্বাপেক্ষা বড়ো বাঁধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার সাহায্যে প্রায় ৫৩০০০০০ একর অনুর্বর জমিতে জলসেচন করা সম্ভব হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে কতখানি জমিতে জলসেচন দ্বারা শস্যোৎপাদন করা হইতেছে তাহার একটা মোটামুটি আভাস নিম্নের তালিকায় দেখানো হইল। এই তালিকাটি ১৯২৭-২৮ খ্রীস্টাব্দে ভারত-গভর্মেণ্টের জলসেচন সম্বন্ধে রিপোর্ট হইতে গৃহীত।

প্রদেশ	কত একর জমিতে ভারত-গভর্মেণ্ট জলসেচন করিয়াছিলেন	চাষে ব্যবহৃত জমির শতকরা
মাদ্রাজ	৭,১৯১,০০০	১৮·৬৫
বোম্বাই	৪১১,০০০	১·৬
সিন্ধুপ্রদেশ	৩,৩৫৩,০০০	৭৬·৮
বঙ্গদেশ	১০২,০০০	·৪
যুক্তপ্রদেশ	২,৩৩৩,০০০	৫·৫
পাঞ্জাব	১০,৩৮১,০০০	৩৫·২
ব্রহ্মদেশ	১,৯৪০,০০০	১০·৭

বিহার ও উড়িষ্যা	৯৪১,০০০	৩.২
মধ্যপ্রদেশ	৪১৫,০০০	২.০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩৯২,০০০	১৫.৩
রাজপুতানা	৩১,০০০	৬.৫
বেলুচিস্থান	২৪,০০০	৬.৩

জমিতে জলসেচন করা যেমন প্রয়োজন, জলনিকাশের আবশ্যকতা তাহা অপেক্ষা কম নহে। আবশ্যক জল জমির উপরে দাঁড়াইয়া থাকিলে জমির নিম্নস্থ ক্ষার উপরে উঠে; ইহাতে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া যায় এবং এই অবস্থা স্থায়ী হইলে জমি কিছুকাল পরে অনুর্বর হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়ত, উদ্ভিদের শিকড়ে বায়ু চলাচল করা দরকার। জমিতে জল দাঁড়াইয়া থাকিলে বায়ু চলাচলের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, কাজেই উদ্ভিদের পুষ্টিসাধন সম্ভব হয় না। তৃতীয়ত, ক্ষেত্রে জল জমিয়া থাকিলে বহুবিধ জৈব ও অজৈব দ্রবীভূত পদার্থ মাটির উপরিভাগে ও নিম্নস্তরে জমা হয়, অনেক সময়েই উহা উদ্ভিদের পুষ্টিলাভের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। উল্লিখিত কারণগুলি ব্যতীত আরও একটি ভাবিবার বিষয় এই যে, জলসেচনের দ্বারা জমির নিম্নস্তরকে সর্বদা আর্দ্র রাখিলে ক্ষেত্রের নিকটস্থ অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপের ইহা একটি প্রধান কারণ। ক্ষেত্র হইতে দুই প্রকারে জল নিষ্কাশন করা সম্ভব। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে মাটির নিম্নস্থ ড্রেনের সাহায্যে জমির অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, অবস্থাবিশেষে অনেকে মাটির উপরে নালা কাটিয়া ক্ষেত্রের জল নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়া পছন্দ করে। আজকাল শেষোক্ত প্রণালী জলনিকাশের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইংলণ্ড, জার্মানি ও অন্যান্য দেশের বহুলক্ষ একর জলাজমি হইতে জলনিকাশ করিয়া ক্রমে ঐ সকল অঞ্চলকে বাসোপযোগী ও শস্যোৎপাদনের অনুকূল করা

হইয়াছে। ঐ সকল উদ্যমের সাফল্যের মূল কারণ, জনসাধারণ দ্বারা গঠিত বিবিধ সমবায়-সমিতির অক্লান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায়। আমেরিকা ও কানাডাতে ১০০,০০০ বর্গমাইলের অধিক বিস্তীর্ণ জলাভূমি ছড়াইয়া আছে। এই সকল স্থান হইতে জল বাহির করিয়া ভালো ফসল উৎপাদন করিবার চেষ্টা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতেছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা যেরূপ দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে তাহাতে জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উর্বর ও বাসোপযোগী জমির পরিমাণ বর্ধিত করা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের বাংলাদেশে নিচু জমি ও বিলের অভাব নাই। বলা বাহুল্য, অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দিলে এই সকল স্থানে উৎকৃষ্ট ফসল উৎপন্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

অবস্থা বিশেষে জলস্রোতের ফলে জমির উর্বরতা ক্ষয় হইতে পারে। অনেক জায়গায় কৃষিভূমি পারিপার্শ্বিক জমির চেয়ে বেশি উঁচু। সেইজন্য সেখানকার উর্বর ও ওপরের স্তরের জমি ধুইয়া নদীর বা বৃষ্টির জলের স্রোতে সমুদ্রে নীত হয়। ইহার ফলে ঐ সকল জায়গার জমির উর্বরতা যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে এবং অনেক জমি একেবারে উৎপাদিকা শক্তি হীন হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুরের জমির উর্বরতা এইজন্যই অনেক হ্রাস পাইয়াছে। উপযুক্তভাবে বাঁধ বাঁধিলে উপরের স্তরের উর্বর জমির গতি রোধ করা সম্ভব।

সারের ব্যবহার

নাইট্রোজেন, প্রস্ফোরক, পটাশ ও চুন উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য বলা যাইতে পারে। চুন সাধারণত সকল জমিতেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। নাইট্রোজেন, প্রস্ফোরক ও পটাশের অভাব অনেক জায়গায় লক্ষিত হয়। এক বিঘা জমি হইতে এক একটি ফসল সাধারণত ৩-৬ সের নাইট্রোজেন, ২-৪ সের

ফস্ফরিক অ্যাসিড এবং ২-১০ সের পটাশ গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া দ্রবণীয় খাদ্যের অধিকাংশ আবার বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া চলিয়া যায়। এইরূপ জমিতে সার প্রয়োগ না করিলে, দুই বা তিন বৎসর পরে ইহাতে আর ভালো ফসল জন্মায় না। এইজন্যই অনেক অসভ্য জাতি দুই বা তিন বৎসর পরে কোনো জায়গায় ফসল উৎপন্ন করিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যায়।

সার সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, (১) বিশেষ সার, ও (২) সাধারণ সার। নাইট্রোজেন, প্রস্ফোরক, পটাশ এবং চুন - এই চারিটি পদার্থের একটির বা একাধিকের গুণবিশিষ্ট সার 'বিশেষ শ্রেণীর' মধ্যে পরিগণিত এবং যে সকল পদার্থের মধ্যে একাধারে ঐ চারিটি পদার্থেরই গুণ আছে তাহাকে 'সাধারণ সার' বলে। 'সাধারণ সার' জীবজন্তু এবং উদ্ভিদের দেহ হইতে পাওয়া যায়। এবং এই শ্রেণীর সারের মধ্যে গৃহজাত সারই সর্বোৎকৃষ্ট। কৃষকগণের গোয়ালে প্রতিদিন যে গোময়, গোমূত্র এবং অন্যান্য আবর্জনা জমা হয় তাহাই গৃহজাত সার নামে অভিহিত। নিয়মমতো মিশ্রিত করিলে গৃহজাত সার বিশেষ কার্যকরী হয়। সাধারণ সারের পর্যায়ে সবুজিসার বা সবজিসার (green manure) উদ্ভিজ্জ-সার, বোঁদমাটি (peat) ও খৈল সারের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধইঞ্চা শন প্রভৃতি শিম্বাদি জাতীয় গাছকে কাঁচা অবস্থায় চাষ করিয়া জমিতে প্রয়োগ করিলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এই সারের নাম সবুজ সার বা সবজিসার। গাছগুলি দুই বা তিন মাসের হইলেই সবজিসারের উপযুক্ত হয়। তরুলতা কিংবা তাহাদের পত্রাদি পচিয়া যে সার হয় তাহাকে উদ্ভিজ্জসার বলে। নানাপ্রকার গলিত উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ পদার্থ বৃষ্টির জলে ধুইয়া পুকুর এবং ডোবার তলাতে যে মাটির স্তর প্রস্তুত করে তাহাকে বোঁদমাটি বলে। খৈলসার সাধারণত, চিনে-বাদাম, রেড়ি, কুসুম-ফুল এবং পোস্ত হইতে উৎপন্ন হয়।

চীনদেশে মানুষের মলমূত্র পচাইয়া সার করিয়া কৃষিকার্যে ব্যবহার করা হয়। অনেকে এইভাবে দেশের স্বভাবজাত সার যাহাতে ব্যবহৃত হয় তাহার

পক্ষপাতী। খুব সাবধানে ঐ সকল পদার্থ ব্যবহার না করিলে উহা হইতে দেশে, বিশেষত পল্লীগুলিতে, নানাপ্রকার ব্যাধির সৃষ্টি হইতে পারে।

বিশেষ সার প্রধানত চারি ভাগে বিভক্ত। নাইট্রোজেন-প্রধান সারের মধ্যে পটাশিয়াম-নাইট্রেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, ক্যাল্‌সিয়াম সায়ানামাইড, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট প্রধান। প্রস্ফোরক-প্রধান সারের মধ্যে অস্থিচূর্ণ বেসিক্ সুপারফস্‌ফেট, বেসিক্ স্লাগ্ ইত্যাদি প্রধান। পটাশ-প্রধান সারের মধ্যে সাল্‌ফেট অফ্ পটাশ ও পটাশ লবণের নাম করা যাইতে পারে। চুন-প্রধান সারের মধ্যে চুনই প্রধান। ইংলণ্ডের বিখ্যাত রথামস্টেড কৃষিক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠাতা সার্ জন্ লওয়েস্ সর্বপ্রথমে সুপারফস্‌ফেট্ প্রস্তুত করিয়া ফসল উৎপাদনে উহার উপকারিতা প্রতিপন্ন করেন। এই সময় হইতেই ব্যাপকভাবে ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশেষ সারের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। এই সকল দেশে জনসংখ্যা এত তাড়াতাড়ি বাড়িয়া চলিয়াছে যে, বিশেষ সার ব্যবহার করিয়া উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ খুব বাড়ানো হইতেছে বলিয়াই সেখানকার অধিবাসীদিগকে প্রতিপালন করা সম্ভব হইয়াছে।

সার ব্যবহার সম্বন্ধে বঙ্গীয় কৃষকগণ সাধারণত অনভিজ্ঞ। তাহারা একমাত্র গোবর-সারেরই ব্যবহার জানে। গোবর-সার প্রতি বিঘায় ৫০ হইতে ১৫০ মন ব্যবহার করা উচিত। একটি সাধারণ গোরু বৎসরে ৭০-৮০ মন সার প্রদান করিয়া থাকে কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশে অর্ধেকের বেশি গোবর জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হইয়া নষ্ট হয়। পূর্ববঙ্গে গোবর জমাইয়া সার প্রস্তুত করার আর একটি বাধা আছে। এখানকার অধিকাংশ গ্রামই বর্ষার সময়ে জলের নিচে থাকে, কাজেই এই সকল স্থানে গোবর জমাইয়া সার প্রস্তুত করা সম্ভব নহে, কারণ বর্ষার জলে গোবর ধুইয়া যায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দেখা যায় যে ঐ সকল অঞ্চলে বিনা সারে ধান্য, পাট প্রভৃতি শস্যের ফসল কম নহে। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে যে যখন পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলি জলপ্লাবিত হয় তখন জলের স্রোতের

সহিত প্রচুর সারবান পলিমাটি জলাভূমিতে আসিয়া পড়ে। কাজেই জমির উৎপাদিকা শক্তির বিশেষ হ্রাস হয় না। বাংলার কৃষকদিগের বিশেষ সার ব্যবহার না করিবার একটি প্রধান কারণ তাহাদের আর্থিক দুরবস্থা।

সারের ব্যবহার ছাড়া নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায় অবলম্বন করিয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায় :

১. কলাই, শন, অড়হর, ধইঞ্চা, সিম্বীজাতীয় শস্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎপাদন করা।

২. শীত ঋতুতে জমি চাষ করিয়া পতিত রাখা।

৩. জমিতে পর্যায়ক্রমে শস্য উৎপাদন করা। ইহাকে শস্যাবর্তন বলে।

৪. প্রতি বৎসর পর্যায়ক্রমে সমস্ত চাষের জমির কিছু অংশ পতিত রাখিয়া তাহাতে পশুচারণ করা।

সকল সারেরই প্রধান উপাদান হইতেছে, নাইট্রোজেন, ফস্‌ফেট ও পটাশ—এই তিনটি পদার্থের একটি, দুইটি বা তিনটিই। ইহাদের মধ্যে নাইট্রোজেন গাছের উদ্ভিজ্জ অংশ বাড়ায়, অর্থাৎ গাছের ডালপালা মোটা ও ঝাড়ালো হয় এবং পাতা বড়ো ও গাঢ় সবুজবর্ণের হয়। ফস্কেট গাছের ফুল ও ফল ধারণের শক্তি বাড়ায়, অর্থাৎ ফুল বেশি ফোটে ও বড়ো হয় এবং ফলও বেশি ধরে ও বড়ো হয়। পটাশ গাছের কাণ্ডের মধ্যে চিনি বা শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি করে এবং গাছের কাণ্ডে ও শাখায় রস চলাচলের সহায়তা করে। শস্যের প্রয়োজন অনুসারে এই তিনটি উপাদানের প্রয়োজনের তারতম্য হয়। শাক, তামাক, বাঁধাকপি, পান প্রভৃতি যে সকল ফসলে উদ্ভিজ্জ অংশই আমাদের দরকার সেই সকল শস্যে নাইট্রোজেন বেশি দিলে উপকার হয়। কিন্তু ফুল বা ফল গাছে ফসফেট্ না দিয়া নাইট্রোজেন বেশি দিলে গাছের তেজ খুব হয় বটে কিন্তু ফুল-ফল কম হয় ও ছোটো হয়।

বাংলাদেশের জমির পক্ষে যে সকল সার বিশেষভাবে উপযোগী, যেমন

সবজিসার, হাড়ের গুঁড়া, উদ্ভিজ্জসার, গোবরসার ও রাসায়নিক সার—এই সকল সারের একটা মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হইল।

সবজিসারের প্রধান উপকারিতা এই যে, ইহা দ্বারা অতি সহজে ও সামান্য খরচে মাটিতে বেশি পরিমাণে জৈব পদার্থ প্রয়োগ করা যায়। সবজিসারের জৈব পদার্থ অতি সহজে মাটির মধ্যে গলিয়া উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত হয় এবং মাটিকে উর্বর করে। তাহা ছাড়া ইহা আঁট মেটেল মাটিকে হালকা ও ফাঁপালো করে এবং বেলেমাটিকে আঁট করে। সবজিসারের গাছ কাঁচা অবস্থায় চষিয়া দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে আগাছা সকলও বীজ হইবার আগে চষা হইয়া যায়। কাজেই সবজিসারের দ্বারা পরোক্ষভাবে আগাছার দমন হয়। সবজিসারের আর একটি প্রধান উপকারিতা হইতেছে যে ইহা দ্বারা শস্য-পর্যায়ের কাজ হয়। সবজিসারের গাছ শিম্বাদিজাতীয় হইলে বেশি উপকার পাওয়া যায়। শিম্বাদিজাতীয় উদ্ভিদে একটি অতিরিক্ত উপকার এই যে, ইহাদের শিকড়ে যে ছোটো ছোটো দানার মতো পদার্থ দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে একপ্রকার জীবাণু বাস করে। ইহা বাতাস হইতে নাইট্রোজেন শোষণ করিয়া মাটিতে জমা করিয়া মাটিকে আরও উর্বর করে। সবজিসার করিতে ধইঞ্চার বীজ বিঘাপ্রতি ৩।৪ সের এবং শন ও বরবটির বীজ বিঘাপ্রতি ৫।৬ সের বুনিলে যথেষ্ট হয়।

হাড়ের গুড়া একটি খুব ভালো সার। ইহার মধ্যে সাধারণত শতকরা ৪ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ২০-২২ ভাগ ফস্‌ফেট্‌ থাকে। বাংলাদেশের মাটির প্রায় সর্বত্রই নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফেটের অল্পবিস্তর অভাব আছে। সুতরাং এদেশে সকল জায়গাতেই শস্যে হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিলে ফসলের ফলন অনেক বাড়ে। হাড়ের গুঁড়ার আরও সুবিধা এই যে, ইহা বর্ষায় গলিয়া যায় না এবং মাটিতে ধীরে ধীরে পচে। কাজেই মাটিতে ইহার গুণ দুই-তিন বৎসর থাকে। মাটির স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তি ও ফসল অনুসারে ইহা বিঘাপ্রতি

এক মন হইতে আধ মন হিসাবে প্রয়োগ করা উচিত। আমাদের দেশে প্রত্যেক গ্রামেই বহু মৃত পশুর হাড় পড়িয়া থাকে। এই সকল হাড় সংগ্রহ করিয়া একটা গর্তের মধ্যে ফেলিয়া যদি কাঁচা হাড়গুলার উপরে মোটা করিয়া চুন ছড়াইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে কয়েক মাস পরেই চুনের তেজে হাড়ের টুকরাগুলি হাজিয়া যায় এবং উহার পচা গন্ধও দূর হয়। তখন হাড়গুলাকে তুলিয়া আনিয়া ঢেঁকিতে ভাঙিয়া জমিতে বেশ সার দেওয়া যায়।

উদ্ভিজ্জসার সকল প্রকার উদ্ভিজ্জ আবর্জনা পচাইয়া প্রস্তুত করা হয়। খেত-নিড়ানো আগাছা, গাছের পাতা, জঞ্জাল, গোরুর খাদ্যের পরিত্যক্ত অংশসমূহ, শহরের আবর্জনা, এমন কি কচুরিপানার মতো জলীয় আগাছা এই উপায়ে বিশেষ মূল্যবান সারে পরিণত করা যায়। উদ্ভিজ্জসার তৈয়ারি করিতে চাষীদের কোনোও পয়সা খরচ বা বেশি পরিশ্রম হয় না— অবসরকালে একটু পরিশ্রম করিলেই চলে। কোনো বড়ো গাছের ছায়াযুক্ত স্থানে আবর্জনা জমা করিয়া পচাইতে হয় এবং গোয়ালের ধোয়ানি বা জল দ্বারা উহা সকল সময়ে সরস রাখা উচিত। যখনই কিছু আবর্জনা পাওয়া যায়— উহা আল্‌গাভাবে স্তরে স্তরে বিছাইয়া রাখিতে হয়। আবর্জনার স্তূপ আন্দাজ চার হাতের বেশি চওড়া ও তিন হাতের বেশি উঁচু না হয়। স্তরের উপরে দুই হইতে তিন সের হাড়ের গুঁড়া অথবা আঙ্গুল পুরু করিয়া টাটকা গোবর এবং তাহার উপরে দুই আঙ্গুল পুরু এক স্তর মাটি ছড়াইয়া দিলে পচা সারের গুণ বাড়ে। গোয়াল-ধোয়া জল বা চোনা বা টাটকা গোবর ১০ হইতে ১৫ গুণ জলে গুলিয়া মধ্যে মধ্যে আবর্জনার স্তূপের উপরে অল্প পরিমাণে ঢালিয়া উহাকে সরস রাখিলে বেশ ভালো ফল পাওয়া যায়। সমান এবং সম্পূর্ণভাবে পচনের জন্য গাদাটাকে অন্তত দুইবার উল্‌টাইয়া দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়বার উল্‌টাইয়া নূতন গাদা করিবার সময়ে গাদার মাথাটা খোড়ো ঘরের চালের মতো দুই পাশে ঢালু করিয়া দিলে বৃষ্টির জল গাদার মধ্যে ঢুকিতে পারে না। এই

প্রণালীতে আবর্জনা সম্পূর্ণ পচিয়া সারে পরিণত হইতে সাধারণত সাড়ে তিন মাস সময় লাগে।

"জৈব-পচন" (biological formentation) নামে বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শহরের দুর্গন্ধময় আবর্জনা পচাইয়া গন্ধহীন, ক্ষতিকর-বীজাণু-বিহীন "হিউমাস"-যুক্ত অতি উত্তম জৈব সার তৈরি করা সম্ভব। আবর্জনা পচানো জৈব-সারকে "কম্পোস্ট" বলা হয়। জমির উৎপাদিকাশক্তি বাড়াইবার পক্ষে এই রকম সার খুবই উপকারী। কম্পোস্ট দেখিতে অনেকটা গোবর সারের মতো— কিন্তু উদ্ভিদের খাদ্যোপকরণ সরবরাহে উহা দ্বিগুণ ফলদায়ক। নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস ও পটাশ এবং চুন, লোহা, ম্যাগ্‌নেসিয়ম্ প্রভৃতি প্রধান ধাতব উপাদান এবং বোরন্, ম্যাঙ্গানিজ্, কোব্লট্, নিকেল, দস্তা প্রভৃতি কণামাত্র প্রয়োজন ধাতব পদার্থ কম্পোস্টের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। বর্ষার জলে রাসায়নিক সারের বেশির ভাগই ধুইয়া গলিয়া যায়— কাজেই প্রতিবৎসরই জমিতে রাসায়নিক সার দিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কম্পোস্ট জলে গলিয়া যায় না বলিয়া তিন বৎসর পর্যন্ত সার প্রয়োগের ফল প্রায় একভাবেই থাকে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক শহরের যাবতীয় আবর্জনা পচাইলে প্রতিবৎসর অন্তত এক কোটি টন এই মূল্যবান কম্পোস্ট সার তৈরি হইতে পারে। কেবল-মাত্র বাংলাদেশের ১১৯টি মিউনিসিপ্যাল শহরের যাবতীয় আবর্জনা পচাইলে বৎসরে অন্তুতপক্ষে ছয় লক্ষ টন বা এক কোটি পয়ষট্টি লক্ষ মন কম্পোস্ট তৈরি হইতে পারে। তাহা ছাড়া এই সকল শহরের আবর্জনা হইতে মূল্যবান জ্বালানি গ্যাস তৈরি করা যায় এবং অবশিষ্ট কঠিন অংশ সারভাবে ব্যবহার করা চলে। এখানে বলা যাইতে পারে যে প্রায় দুই বৎসর আগে ভারতসরকার দেশের কৃষি সম্পদ বৃদ্ধি ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আবর্জনা হইতে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যাপক ও নিয়মিতভাবে সারপ্রস্তুতের এক বিরাট পরিকল্পনার প্রবর্তন করিয়াছেন। আশা করা যায় যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৫০০টি

কেন্দ্রে অন্যূন চার লক্ষ টন সার প্রস্তুত সম্ভব হইবে। বাংলাদেশে হাওড়া, হুগলী, চুঁচুড়া, রাজশাহী, উত্তর বারাকপুর, খুলনা প্রভৃতি অনেক শহরের মিউনিসিপ্যালিটি এই পরিকল্পনাতে যোগ দিয়াছে এবং হাওড়াতে মাসিক প্রায় ৬০০ গাড়ি (৩০০ টন), রাজশাহীতে ৩০০ গাড়ি ও হুগলী চুঁচুড়াতে ১৫০ গাড়ি কম্পোস্ট সার তৈরি হইতেছে।*

গোবরসার গোবর পচাইয়া উৎপন্ন হয়। গোবর সহজপ্রাপ্য কিন্তু বাংলার চাষীরা বহু পরিমাণ গোবর ঘুঁটে করিয়া নষ্ট করে এবং বাকি গোবর ফাঁকা জায়গায় ফেলিয়া রাখিয়া অযত্নে নষ্ট করিয়া ফেলে। জ্বালানির জন্য গোবর নষ্ট না করিয়া বাংলার চাষীরা যদি বনজঙ্গল বা ফলহীন জীর্ণ গাছগুলি কাটিয়া জ্বালানি সংগ্রহ করে তবে গ্রামের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয় এবং মূল্যবান সারটা জমির উৎপাদিকাশক্তি বাড়াইতে ব্যবহার করা যাইতে পারে। রৌদ্রের উত্তাপে ও বৃষ্টির জলে যাহাতে গোবরের মূল্যবান সার পদার্থ নষ্ট হইয়া না যায় এইজন্য গোবরকে ফাঁকা জায়গায় ফেলিয়া না রাখিয়া একটি অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় একটা গর্তের মধ্যে রাখিয়া সেই গর্তের উপরে খড় কি তালপাতার ছাউনি করিয়া দিলে গোবরের তেজ একটুও নষ্ট হয় না, উঁচু জায়গায় গর্ত করিলে বর্ষার জল গড়াইয়া গর্তে জমিতে পারে না। তা ছাড়া গোমূত্র একটি মূল্যবান সার এবং উহা নষ্ট হইতে দেওয়া কখনোই উচিত নহে। গোয়ালের মাটির মেঝেটাকে ভালো করিয়া পিটিয়া বাহিরের দিকে একটু ঢালু করিয়া মেঝের গা দিয়া একটি সরু নালা খুঁড়িয়া সেই নালার একপ্রান্তে একটা মাটির গামলা বা অন্য কোনো পাত্র বসাইয়া দিলে মূত্রটা প্রত্যহ ঐ পাত্রে জমিতে পারে এবং প্রতিদিন সকালে ঐ চোনা গর্তের গোবরের উপরে ছড়াইয়া দিলে

* কম্পোস্ট সার সম্বন্ধে লিখিত অংশটি "কৃষি-কথার" পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমেঘনাদ বসাকের "শহরের আবর্জনা ও কৃষিসম্পদ" প্রবন্ধ অবলম্বনে সংকলিত।

উহা গোবরকে ভিজাইয়া শীঘ্র পচাইয়া দেয় এবং উৎপন্ন গোবর সার আরও তেজস্কর হয়।

সবজিসার, হাড়ের গুঁড়া, উদ্ভিজ্জসার বা গোবরসারের প্রয়োগের সুফল তাড়াতাড়ি বোঝা যায় না। কারণ এই সকল সারের নাইট্রোজেন, ফস্ফেট ও পটাশ জটিল বা সরল জৈব পদার্থের অংশরূপে থাকে। অক্সিজেনের সাহায্যে মাটির জীবাণুগুলি এই সকল জৈব পদার্থকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করিয়া অজৈব পদার্থে পরিণত করে। উদ্ভিদ এই সকল অজৈব পদার্থ হইতে তাহাদের খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়া যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। যদি তাড়াতাড়ি উদ্ভিদের পুষ্টি-সাধন প্রয়োজন হয় তাহা হইলে জমিতে বিশেষ উপাদানবিশিষ্ট অজৈব সার দেওয়া উচিত। বাংলার মাটিতে সাধারণত যে পরিমাণে পটাশ থাকে, শস্যের পক্ষে তাহা যথেষ্ট। কিন্তু নাইট্রোজেন ও ফসফেট যাহা থাকে তাহা যথেষ্ট নহে। বিশেষ করিয়া নাইট্রোজেনের অভাবই সবচেয়ে বেশি। শুধু নাইট্রোজেন দিবার প্রয়োজন হইলে অজৈব সারের মধ্যে "সালফেট অফ অ্যামোনিয়া", "নাইট্রেট অফ সোডা" এবং "নাইট্রেট অফ পটাশ" (সোরা) সবচেয়ে ভালো। শুধু ফসফেট দিবার প্রয়োজন হইলে "সুপারফসফেট" সবচেয়ে ভালো। নাইট্রোজেন এবং ফসফেট দুইই দিতে হইলে "নিসিফস" এবং "অ্যামোফস" সবচেয়ে ভালো। এই সকল রকম বিশেষ সারের মধ্যে সালফেট অফ অ্যামোনিয়া জমির উৎপাদিকাশক্তি বাড়াইতে বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশে রসায়নশিল্পের সুদক্ষ পরিচালনার কল্যাণে সালফেট অফ অ্যামোনিয়া এখন প্রায় অফুরন্ত পরিমাণে সরবরাহ হইতেছে। ইহার ফলে ঐ সকল দেশের উৎপাদিকাশক্তি বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে, বিশেষ করিয়া রবিশস্যের সময়ে, উপযুক্ত পরিমাণে অ্যামোনিয়া সালফেট ব্যবহার করিলে, উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ যে বহুগুণ বাড়িয়া যাইবে, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এদেশের চাষীরা বিশেষ

গরীব। সুতরাং সরকার পক্ষ হইতেই চাষীদিগকে বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে সালফেট অফ অ্যামোনিয়া সরবরাহ করা উচিত। দেশকে কৃষিজাত পদার্থ বিষয়ে স্বাবলম্বী করিতে হইলে খরচ যাহাই লাগুক না কেন সালফেট অফ অ্যামোনিয়া প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা দরকার এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী বায়ুর নাইট্রোজেন হইতে উহা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র স্থাপন করা বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। অবশ্য ভারতবর্ষের মাটির পক্ষে জৈব সারও বিশেষ প্রয়োজন এবং হিসাবমতো ফসলবিশেষে জৈব সার ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করিলে বাংলাদেশে কৃষির আশাতীত উন্নতি হইতে পারে।

ভারতবর্ষের জমির মানচিত্র

ভারতবর্ষের জমিকে মোটামুটি ছয়ভাগে ভাগ করা যায়—(১) পলিমাটি, (২) কালোমাটি, (৩) লালমাটি, (৪) ল্যাটারাইট মাটি, (৫) মরুভূমি ও (৬) জলা জমি। ভারতবর্ষের মোটামুটি একটা জমির মানচিত্র দেওয়া গেল। এই মানচিত্র থেকে কোন্ জায়গায় কী রকম মাটি আছে তাহা বোঝা যাইবে। সাধারণভাবে বলা চলে যে ভারতবর্ষের পূর্ব ও পূর্ব-পশ্চিম দিকে—যথা আসাম, বাংলাদেশ, উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ ও মহীশূরে— বেশির ভাগ লাল ও ল্যাটারাইট মাটি। এই সকল জায়গাতে বৃষ্টি খুব বেশি হয় এবং প্রধান ফসল হইতেছে ধান। ভারতবর্ষের মধ্য এবং পশ্চিম দিকে—মধ্য প্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই ও গুজরাটে বেশির ভাগ কালো মাটি। এই সকল জায়গাতে মাঝারি রকমের বৃষ্টি পড়ে এবং জোয়ার, বাজরি প্রভৃতি মিলেট (millet) জাতীয় শস্য ও তুলা প্রধান ফসল। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে— যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ ও বেলুচিস্থানে বেশির ভাগ জমি পলিমাটি শ্রেণীর। এই সকল জায়গাতে খুব কম বৃষ্টিপাত হয় এবং প্রধান ফসল হইতেছে গম।

বাংলাদেশের জমি ও তাহার আবাদ

বহুপূর্বে অন্তত ১০ কোটি বৎসর আগে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ছিল না। সেকালে উত্তরভারতের উপরিভাগ দিয়া বিস্তীর্ণ জলরাশি বঙ্গোপসাগর ও ভারত-সাগরকে সংযুক্ত করিয়া রাখিত। হিমালয় অঞ্চল ও অন্যান্য নিকটবর্তী পর্বত হইতে মৃত্তিকা ও পলিমাটি জলস্রোতে প্রবাহিত হইয়া ধীরে ধীরে বাংলাদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের উৎপত্তি হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এইসকল স্থানে দুই শত ফুটের অধিক খনন করিয়া বিস্তর সামুদ্রিক প্রাণীর কঙ্কাল পাইয়াছেন, কিন্তু স্থিতিশীল পাহাড়ের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। জলবাহিত মৃত্তিকা নানাস্থান হইতে উদ্ভিদের পুষ্টিকর জিনিস আনিয়া থাকে এবং এইজন্যই বাংলা-দেশের মাটি খুব উর্বর। পর পৃষ্ঠায় সাধারণভাবে বাংলাদেশের মাটির মানচিত্র দেখানো হইল।

বাংলার মাটি প্রায় সবই পলিমাটি শ্রেণীর অন্তর্গত। এদেশকে নদীমাতৃক দেশ বলে কারণ অসংখ্য ছোটো বড়ো নদী বাংলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত। বহুদূর হইতে ধোয়া মাটি এই সকল নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া পলিরূপে জমা হইয়া মাটিকে সরস ও উর্বর করে। কেবল বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও চট্টগ্রাম জেলায় স্থিতিশীল মাটি দেখা যায়, অপর সব জেলারই মাটি পলিশ্রেণীর। বাংলার পলিমাটি মোটামুটি দুই প্রকারের—পুরাতন পলি ও নূতনপলি। পুরাতন পলিমাটির রং লালচে এবং ইহা নূতন পলিমাটি হইতে ভিন্ন। পুরাতন পলিমাটি পূর্ববঙ্গের মধুপুর জঙ্গল এবং উত্তরবঙ্গের বরিন্দ এলাকার মধ্যেই অবস্থিত। অবশিষ্ট পলিমাটি অল্পবিস্তর নূতন। সুন্দরবন এবং চট্টগ্রাম জেলার উপকূলবর্তী এলাকাসমূহের পলিমাটি সর্বাপেক্ষা নূতন। স্থিতিশীল মাটি ও পুরাতন পলিমাটির মিলিত পরিমাণ অপেক্ষা নূতন পলিমাটির পরিমাণ অনেক বেশি। পুরাতন পলিমাটিতে চুন এবং ফসফেট

নামক পদার্থের পরিমাণ কম, কিন্তু পটাশ নামক ক্ষারপদার্থ বেশি থাকে এবং অত্যন্ত অম্লরসাক্ত। বর্ধমান বিভাগের বীরভূম, বাঁকুড়া, প্রভৃতি জেলার মাটি নানা আকার ও নানা আয়তনের লাল কাঁকরে পূর্ণ। নূতন পলিমাটি দামোদর ভাগীরথী, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, শীতলাক্ষা প্রভৃতি বহু নদ নদীর পলিতে গঠিত। এ মাটি সাধারণত বেশ হালকা ও সরস এবং বৎসরের কোনো সময়েই ইহার রস সম্পূর্ণ শুষ্ক হয় না। সব নদীর পলি সমান উর্বর নহে। ভাগীরথী ও পদ্মার পলিমাটি অপর সকল নদীর পলিমাটি অপেক্ষা বেশি উর্বর।

বাংলাদেশের আবাদের অধিকাংশ জমিই সমতল। সমতলক্ষেত্রে সাধারণত যে সকল শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি এই—ধান্য, তিলশস্য, পাট, ভুট্টা, গম, ইক্ষু, ডাইলশস্য এবং তামাক। চাষের দিক হইতে অন্যান্য দেশের মাটির মতো এই দেশের মাটিকেও তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন এঁটেল, দোঁয়াশ এবং বেলে। কর্দমময় মৃত্তিকা বা এঁটেল মাটিতে পাট, শাক, গম, তুঁত, মুগ, মটর, ছোলা, লাউ, ঝিঙা, শসা, বরবটি, অড়হর, আমন-ধান, লঙ্কা প্রভৃতি ফসল ভালো জন্মে। দোঁয়াশ মাটিতে আলু, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, শালগম, গাজর, বীট, মুলা, পেঁয়াজ, বেগুন, মানকচু, রাঙাআলু, মটর, মুগ, মসুর, ছোলা, যই, ভুট্টা, যব, তামাক, পান প্রভৃতি ভালো জন্মাইতে পারা যায়। বালুকাময় জমিতে ফুটি, তরমুজ, পটল, শাঁক আলু, তিল, ধইঞ্চা, শন, যব মুগ, সরিষা, চিনাবাদাম, ভাদুই-ধান ও আলু ভালো ফলন হয়।

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও জল, হাওয়া ও উত্তাপের উপর আবাদের কাল নির্ভর করে। পূর্ববঙ্গে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে অল্প বৃষ্টি হয় বলিয়া ঐ সময়ে পাট, তিল, আউশ ধান্য, ভুট্টা প্রভৃতি জন্মানো হয়। কিন্তু যশোহর, নদীয়া, খুলনা, ২৪ পরগণা প্রভৃতি স্থানে এই ফসলগুলি জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে লাগানো হইয়া থাকে। হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা প্রভৃতি স্থানে রবিশস্য কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে লাগানো হয়—কিন্তু পূর্ববঙ্গে উহা অগ্রহায়ণ কি

পৌষ মাসে লাগানো হয়। এদেশের চাষীরা কৃষিকার্যে সফলকাম হইবার জন্য সুবৃষ্টি ও সুচাষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। নিয়মিত বৃষ্টি হইলে সুফল লাভ হয়, কিন্তু তাহা না হইলে ফসলের বিস্তর ক্ষতি হইতে থাকে। বৃষ্টির অভাব হইলে কৃত্রিম উপায়ে জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা করা উচিত। আজকাল অনেকে নলকূপের সাহায্যে জমিতে জলসেচন করেন। নলকূপের জলে নানা-প্রকার খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকায় উহা ফসলের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

বাংলাদেশের জমি বহু খণ্ডে বিভক্ত থাকায় ও বর্ষায় জমি অত্যধিক নরম হয় বলিয়া এদেশের কলের লাঙ্গল ও উন্নত বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্রের দ্বারা চাষ লাভ-জনক হইতে পারে না। এদেশের লাঙ্গল বলদে টানে এবং অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এদেশের লাঙ্গল হালকা এবং দামও কম। বলা বাহুল্য গোজাতির উন্নতির উপরে এ দেশের কৃষকগণের আর্থিক ও শারীরিক উন্নতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। গোরু ও বলদের প্রতিপালনের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ঘাসের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সর্বত্রই গিনি ঘাস, নেপিয়ার ঘাস, বরবটি. খেসারি, কলাই প্রভৃতি পশুখাদ্যের আবাদ করা উচিত।

বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অনেকটা জায়গা লোনাভূমি, যেমন সুন্দরবন। লোনামাটি কৃষিকার্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। উপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা সুন্দরবনকে কৃষিকার্যের উপযুক্ত করা হইয়াছে। সুন্দরবন বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক ভূমিখণ্ডের সমষ্টি। এই ভূমিখণ্ডগুলি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ নদী বা খাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন। যাহাতে লোনাজল প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য এই বিচ্ছিন্ন ভূমিখণ্ডগুলির চারিদিকে বাঁধ দিতে হয়। বাঁধ দিবার সঙ্গে সঙ্গে বনে আগুন লাগাইয়া জঙ্গল কাটানো উচিত। ইহাতে বাঘ ও ম্যালেরিয়া এই দুই প্রকার শত্রু হইতেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। বাঁধ দেওয়া ও জঙ্গল কাটার পরে যাহাতে মৃত্তিকার লবণ বৃষ্টির জলে ধুইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইতে পারে এইজন্য মধ্যে মধ্যে নালা কাটিয়া জল নিকাশের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এইরূপ ব্যবস্থার দ্বারা তিন-চার বৎসরের

মধ্যেই লোনামাটি মিঠা হয় এবং শস্যফলনের উপযোগী হয়। সুন্দরবনের মৃত্তিকা অতিশয় উর্বর এবং উক্ত প্রণালী দ্বারা বিনা সারেই অনেকদিন হইতে প্রচুর শস্য উৎপাদন করা হইতেছে।

চট্টগ্রাম বিভাগে ও ময়মনসিংহের নিকটবর্তী আসামের পার্বত্য অঞ্চলে নাগা গারো প্রভৃতি আদিম জাতিসমূহ আজকালকার দিনেও শিকার ও 'ঝুম' চাষ দ্বারা জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে। তাহারা পার্বত্য বনজঙ্গল কাটিয়া ও পোড়াইয়া পরিষ্কার করে। এইরূপ জায়গায় পাঁচ-ছয় ঘর পরিবার মিলিয়া তাহারা একটি বসতি করে। লাঙ্গলের চাষ এখনও এই জাতিদের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। ইহারা বসতির নিকট স্থানে স্থানে বাঁশের বা কাঠের খুঁটা দিয়া মাটি খুঁড়িয়া এক এক জায়গায় বিভিন্ন ঋতুর উপযোগী বিভিন্ন বীজ মুঠা মুঠা করিয়া বপন করে। জমি খুব উর্বর বলিয়াই প্রথম দুই-তিন বৎসর তাহারা বেশ ফসল পায়।

বাংলার কৃষির অবস্থা

বঙ্গদেশে প্রায় শতকরা ৮০ জন লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। সমগ্র ভারতবর্ষে শতকরা প্রায় ৭০ জন লোক চাষের উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষের তুলনায় অন্যান্য দেশের কৃষকের সংখ্যা অনেক কম। ইংলণ্ডে শতকরা মাত্র ৭ জন লোক চাষের কাজ করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা প্রায় ২২ জন, কানাডা ও জার্মানিতে শতকরা প্রায় ৩১ জন, ফ্রান্সে শতকরা ৩৮ জন এবং জাপানে শতকরা ৫০ জন লোক চাষের কাজ করে। কিন্তু বিদেশের সহিত আমাদের কৃষিপ্রণালীর তুলনা করিলে আমাদের স্থান যে খুব নিম্নে তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের সর্বত্র উন্নত ধরনের কৃষি-যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ-আবাদের দ্বারা শস্য উৎপন্ন হইতেছে।

উৎপাদিত শস্য নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিভিন্ন দ্রব্যে পরিণত হইয়া ঐ সকল দেশে প্রচুর অর্থাগম হইতেছে। বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক সার ও অন্যান্য সাধারণ সার প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল দেশের জমির উৎপাদিকাশক্তি ক্রমশই বর্ধিত হইতেছে। শস্য-পর্যায়, বীজ নির্বাচন ও বীজ-সুরক্ষণ দ্বারা উৎকৃষ্ট বীজ উৎপন্ন হইয়া ঐ সকল দেশে শস্যের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। জাপান বিশ-পঁচিশ বৎসর আগেও বাংলাদেশ ও ব্রহ্মদেশ হইতে প্রতি বৎসর সাত-আট কোটি টাকার ধান কিনিত। এখন সেই জাপান আধুনিক উন্নত প্রণালীতে চাষ করিয়া প্রচুর ধান জন্মাইয়া নিজের অভাব সম্পূর্ণ পূরণ করিয়াছে।

বাঙালীদের খাদ্যের মধ্যে নিম্নলিখিত জিনিসগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—চাউল, গম, ডাল, গুড়, আলু ও সরিষার তৈল। দুঃখের বিষয় ইহাদের মধ্যে কোনো জিনিসই আমরা প্রয়োজনমতো উৎপন্ন করি না। বাংলার প্রধান ফসল— ধান, পাট, আখ, আলু, তামাক, সরিষা ছোলা ও গম। ইহার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ফসল ধান। মোট আবাদী জমির শতকরা নব্বই ভাগে ধানের চাষ হয়। কিন্তু এদেশে বিঘাপ্রতি গড় ফসল মাত্র ৭ মন; চীন, জাপান, স্পেন, ইটালী, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশে বিঘা হিসাবে ধান ফলে ৩০ হইতে ৫০ মন। আখ বাংলায় সাধারণত বিঘাপ্রতি গড়ে ১০০ বা ১২৫ মনের বেশি ফলে না, কিন্তু জাভা, হাওয়াই, ফিলিপাইন প্রভৃতি স্থানে বিঘায় আখ ফলে গড়ে ৪৫০ মন। বাংলাদেশে সাধারণ চাষীর জমিতে যে ফসল কম ফলে, তাহা মাটির দোষ আদৌ নহে—চাষের প্রণালীর দোষ। এদেশে ফসল কম ফলার মূল কারণ তিনটি— (১) ভালো বীজের অভাব, (২) জল-সেচনের সুবিধার অভাব এবং (৩) উপযুক্ত সারের অভাব। যথোচিত প্রণালীতে চাষ করিয়া বাংলার মাটিতে তিন-চারি গুণ ফসল জন্মানো সম্ভব হইয়াছে। যেখানে ধানের গড় ফলন বিঘাপ্রতি মাত্র সাত মন, সেখানে ভালো

করিয়া চাষ করিয়া বিঘায় কুড়ি-বাইশ মন ফলিতেও দেখা গিয়াছে। রাজসাহীতে কৃষি-বিভাগের উপদেশ পালন করিয়া বহু চাষীর জমিতে বিঘায় তিন শত হইতে সাড়ে তিন শত মন পর্যন্ত আখ ফলিয়াছে।

বর্তমান অবস্থায় স্বাবলম্বী হওয়া ছাড়া আমাদের অন্য কোনো উপায় নাই। বাংলার জনসাধারণের দেশের বর্তমান বিপদ উপলব্ধি করিয়া দেশের খাদ্যসম্ভার বাড়াইবার চেষ্টা করা উচিত। বাংলার আবাদী জমির ও অনাবাদী জমির পরিমাণ নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :

বাংলা দেশের জমিবিভাগ	১৯১৬-১৭	১৯৩৬-৩৭
জরীপ অনুসারে মোট জমি	... ৫,০৫,২৯,৮০৫ একর	৪,৯২,৫৪,৫৯৬ একর
মোট কত জমিতে ফসল উৎপন্ন করা হইয়াছে	...২,৪৭,৫৩,৪১০ একর	২,৪৪,৬৬,৩০০ একর
চাষের জমি কিন্তু ফসল উৎপন্ন করা হয় নাই	... ৫৫,০০,৪৫৩ একর	৪৬,৯০,৮৩৬ একর
চাষের উপযোগী জমি কিন্তু কখনও চাষ করা হয় না	... ৪৯,৪৯,৬১৩ একর	৫৯,৪৯,৮৬৬ একর
চাষ করা সম্ভব নহে	...১,০৯,৪৬,৬৭৩ একর	৯৬,৯২,২৩১ একর
বন-জঙ্গল	... ৪৩,৭৯,২৫০ একর	৪৪,৫৫,০১৬ একর

যদি অনাবাদী জমিগুলিতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে একসঙ্গে বেকার-সমস্যা ও অন্নসমস্যার কিছু সমাধান হইবে। দেশের অর্থ এবং ব্যবসা বাণিজ্য উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের উপর অনেকটা নির্ভর করে। এই উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে কৃষি-প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানার প্রয়োজন আছে। ছেলেদের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে ভালো হয়। দেশীয় ভাষায় রচিত কৃষি ও ব্যবসা বিষয়ে পুস্তক জনসাধারণের নিকট প্রচার করা আবশ্যক।

মধ্যে মধ্যে পল্লীকেন্দ্রগুলিতে কৃষি-প্রদর্শনী করিয়া বা কৃষি বিষয়ে সভাসমিতি করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ-আবাদের প্রসারের জন্য চেষ্টা করা উচিত। তাহা ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে উপযুক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান খোলা দরকার যাহাতে ক্ষেত্রে উৎপাদিত কাঁচা মাল নিত্যব্যবহার্য শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত হইতে পারে। বিদেশীয়েরা ভারতবর্ষে উৎপন্ন কাঁচা মাল মাটির দামে কিনিয়া পরে নানারূপ শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত করিয়া প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিতেছে। দেশের এবং দেশীয় কৃষকদিগের দারিদ্র্যের ইহাও একটি প্রধান কারণ।

বাংলাদেশে প্রতি কৃষক-পরিবারের গড়ে বাৎসরিক আয় মাত্র ২২৫৲ টাকা। একটি পরিবার গড়ে পাঁচটি পরিজন দ্বারা গঠিত। সুতরাং বাংলাদেশের চাষীর মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ৪৫৲ টাকা, মাসিক ৩৸৹। এই আয়ে চাষীরা অতি কষ্টেই কালাতিপাত করিতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক চাষীর লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, কী উপায়ে তাহার আয় বাড়িতে পারে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা যে অনুপাতে বাড়িয়া চলিয়াছে সেই অনুপাতে জমি বাড়িবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বাংলার কৃষক-পরিবারের চাষের জমির পরিমাণ গড়ে প্রায় ১৪ বিঘা। এই ১৪ বিঘা জমি হইতে আমাদের চাষীরা যে আয় করে তাহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অতিশয় কম। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে যে বাংলাদেশের চাষের জমির শতকরা মাত্র দশ ভাগে রবিশস্যের আবাদ হয়, অর্থাৎ পাঁচ ভাগের চার ভাগ জমি বৎসরের অর্ধেক সময় পতিত থাকে। অবশ্য বাকি শতকরা ৮০ ভাগ জমির মধ্যে গভীর জলের ধান এবং বোরো ধানের জমির মিলিত পরিমাণ প্রায় ১৫-২০ ভাগ হইবে। কাজেই বাংলাদেশের আবাদী জমির অন্তত শতকরা ৬০ ভাগ রবিশস্যের চাষের উপযোগী হইয়াও পতিত থাকে। অবশ্য এত কম রবিশস্য উৎপন্ন হওয়ার দুইটি কারণ আছে— (১) ধান কাটার পরই সমস্ত গোরুকে মাঠে

অবারিত ছাড়িয়া দেওয়ার প্রথা, এবং (২) জল সেচনের সুবিধার অভাব। গ্রামের চাষীরা তৎপর হইয়া নেপিয়ার ঘাস, গিনি ঘাস প্রভৃতি গোরুর খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমানে অনাবাদী জমিতে উৎপন্ন করিলে এবং জলের ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট হইলে উল্লিখিত দুইটি বাধাই দূরীভূত করা যাইতে পারে।

রবিশস্যের মধ্যে প্রধান কতকগুলির নাম বলা হইল—

১. মটর, বীন বা বিলাতী সিম, বাঁধাকপি, ফুলকপি, বিলাতী বেগুন, শালগম, পেঁয়াজ, লেটুস বা শ্যালাদ প্রভৃতি বিলাতী সবজি।

২. মসুর, ছোলা, মটর, কুর্তি-কলাই প্রভৃতি ডালশস্য।

৩. গম, যব, যই, সরিষা প্রভৃতি শস্য।

৪. আলু এবং পালংশাক, মুলা, পটল প্রভৃতি সবজি।

৫. তরমুজ, কাঁকুড়, ফুটি প্রভৃতি ফল।

বাংলাদেশে গো-সমস্যা

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশে গোরুর সংখ্যা কম নহে—বরং বেশি বলা চলে। কিন্তু বাংলায় ভালো গোরু নাই। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার গোরু খুবই নিকৃষ্ট। বাংলার গাভী গড়ে দিনে মাত্র পাঁচ পোয়া দুধ দেয়। গোরুর উন্নতি করিতে হইলে তিনটি দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে —(১) ভালো ষাঁড় দ্বারা প্রজনন, (২) দেশীয় নিকৃষ্ট ষাঁড়গুলি দামড়া করিয়া দেওয়া, এবং (৩) যথেষ্ট গোখাদ্যের চাষ করা। গোরুই বাংলার কৃষির একমাত্র মেরুদণ্ড। তাহা ছাড়া স্বাস্থ্যের দিক হইতে দেখা যায় যে খাঁটি ও প্রচুর দুধের অভাবে বাংলার ঘরে ঘরে মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা চাই যে আমাদের গোরু প্রচুর পরিমাণে দুধ দিক এবং আমাদের বলদ আরো ভালো করিয়া লাঙ্গল টানুক, কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে গোরুকে সবল ও সুস্থ

রাখিতে হইলে তাহাদের পুষ্টিকর খাদ্যের দরকার, তাহাদের বাসস্থান পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক এবং তাহাদের রোগ হইলে চিকিৎসার দরকার। এখানে বলা যাইতে পারে যে হরিয়ানা ষাঁড়ের দ্বারা দেশী গাভীর প্রজনন কার্যে বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে। বালাদেশে প্রতি বৎসর গড়ে কুড়ি লক্ষ গবাদি পশু আমদানি করা হয়।

বাংলাদেশে শস্যের শত্রু এবং শস্যের রোগ

পোকার উৎপাতে ও রোগে আমাদের দেশে শস্যের কম ক্ষতি হয় না। শতকরা প্রায় ২০ ভাগ ফসল উহাতে নষ্ট হয়। নিম্নে কতকগুলি প্রধান শস্যের শত্রু ও রোগের উল্লেখ করা হইল।

আখে মাজরা পোকা নামক এক প্রকার কীট দেখা যায়। পোকা চারা-গাছের গোড়া ফুটা করিয়া ভিতরের কচি পাতা খাইয়া ফেলে। তাহাতে চারাগাছের মাঝের কচিপাতা শুকাইয়া খড়ের মতো দেখায়। তাহা ছাড়া আখে 'স্মাট্' রোগ নামক একপ্রকার ছাতা রোগ হয়। ইহাতে গাছের মাথায় কচি পাতার স্থানে একটা কালো রঙের শীষের মতো বাহির হয়। এই রোগ অত্যন্ত সংক্রামক। আক্রান্ত গাছগুলি শাখা পোড়াইয়া বা পুঁতিয়া ফেলিলে মাজরা পোকা ও 'স্মাট্' রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। পাটগাছে শুঁয়া পোকার আক্রমণ হয়। এই পোকা গাছের পাতা খাইয়া গাছকে দুর্বল করিয়া ফেলে। কেরোসিন মিশ্রিত জলে উক্ত পোকাসমেত আক্রান্ত পাতাগুলা ফেলিয়া দিলে পোকাগুলা সব মরিয়া যায়। পান গাছে 'পাবে মরা' নামক ছাতা জাতীয় রোগ দেখা যায়। "বোর্দো মিক্‌চার" (তুঁতে ও পাথর পোড়া মিশ্রিত জল) ছিটাইয়া দিলে পানের এই রোগ সহজে নিবারিত হয়।

ধানের গাছে বহু কীট-শত্রুর আবির্ভাব হয়। 'লেদা পোকা' ও ফড়িং ধানগাছের পাতা খাইয়া ফেলে। 'মরিচ পোকা' পাতার ভিতরে প্রবেশ করিয়া গাছের পাতার উপর ও নিচের স্তরের মধ্যে নরম অংশ খাইয়া ফেলে। 'নলি পোকা' ধানের পাতা খায়। ধানের সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকর শত্রু হইতেছে 'মাজরা পোকা'। এই পোকা পূর্ণবয়স্ক ধানগাছের ডাঁটায় ফুটা করিয়া প্রবেশ করিয়া ভিতরের সার কুরিয়া খায়। ইহার ফলে হয় ধানের শীষ একেবারেই বাহির হয় না—অথবা সাদা রঙের ফাঁপা শীষ বাহির হয়, যাহাতে ফুল ফোটে না বা দানা হয় না। আলোক-ফাঁদের সাহায্যে এই পোকার বংশবৃদ্ধি বন্ধ করা যায়। ধান কাটার পরেই মাঠে আগুন ধরাইয়া গোড়াগুলা পোড়াইয়া জমি চষিয়া দিলে গোড়ায় অবস্থিত সমস্ত পোকা মরিয়া যায়।

এক প্রকার কালো রঙের লেদা পোকা তামাক ও বিলাতী সবজির অতিশয় অনিষ্ট করে। আলুতেও এই পোকার আক্রমণ হয়। সবুজ রঙের একপ্রকার লেদা পোকা ফুলকপির ও বাঁধাকপির অত্যন্ত অনিষ্ট করে। পোকাসমেত পাতাগুলি কেরোসিন-মিশ্রিত জলে ফেলিয়া দিলে পোকাগুলি মরিয়া যায়। 'আঁচা' বা 'বিছা' নামক শুঁয়া-পোকা ছোলা, মটর, খেসারি, মসুর প্রভৃতি ডাল-শস্যের অনিষ্ট করে। ইহারা গাছের সমস্ত পাতা খাইয়া ফেলে। প্রথম অবস্থায় এই পোকাগুলিকে বাছিয়া মারিয়া ফেলা উচিত।

নীরোগ বীজের ব্যবহার

রুগ্ন বীজ হইতে শস্যে নানাপ্রকার রোগ জন্মিতে পারে। কাজেই ভালো শস্য পাইতে হইলে নীরোগ বীজ বপন করা দরকার। সাধারণ দৃষ্টিতে নীরোগ বীজ বাছিয়া বাহির করা বড়ো কঠিন। সাধারণত বীজগুলিকে জলে ডুবাইলে রুগ্ন বীজ জলে ভাসিয়া উঠে। জলে ভাসা বীজগুলি ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্ট বীজগুলি তাড়াতাড়ি রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে চলিবে। তুঁতের জল বা

ফরমালিন মিশ্রিত জলের সাহায্যেও বীজের শোধন সম্ভব হইতেছে। গরম জলে বীজ ভিজাইয়াও বীজগুলিকে রোগমুক্ত করা যায়। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে কৃষকেরা নীরোগ বীজ বপন করিয়া ফসল উৎপাদনের প্রভূত উন্নতি-সাধন করিয়াছে। আমাদের দেশেও যদি সরকার পক্ষ ও চাষীরা তৎপর হয় তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান করা অবশ্যই সম্ভব হইবে।

বাংলায় ধানের চাষ

বাংলাদেশে প্রায় চারি হাজার জাতের ধান আছে। কিন্তু এই সমস্ত ধানকেই পাঁচটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

১. ডাঙা জমির আউশ ধান—এই ধান উঁচু জমিতে সাধারণত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ছিটাইয়া বোনা হয় এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে কাটা হয়।

২. রোপা আমন বা হৈমন্তিক ধান—জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজতলায় বীজ বুনিয়া আষাঢ়-শ্রাবণে জমিতে কাদা করিয়া এ ধানের চারা রোপণ করা হয়। কার্তিক মাস হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত এই ধান কাটার সময়। বাংলার আবাদী ধানের প্রায় বারো আনা এই ধান এবং ইহা বাংলার সর্বপ্রধান শস্য। বাংলাদেশের মিহি ধানের প্রায় সবই এই শ্রেণীভুক্ত।

৩. নিচু জমির আউশ ধান—ঐ ধান নিচু বিল-জমিতে মাঘ-ফাল্গুন মাসে প্রথম বৃষ্টিতে ছিটাইয়া বোনা হয়। গাছ বড়ো হইলে এই সকল জমিতে বানের জল আসে এবং তিন-চারি হাত গভীর জলে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে এই ধান কাটা হয়।

৪. নিচু জমির আমন ধান—ইহা নিচু জমির আউশ ধানেরই মতো, কিন্তু উহার চেয়ে আরো নিচু জমিতে, একই সময়ে ছিটাইয়া বোনা হয় এবং অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে ইহা কাটা হয়।

৫. বোরো বা গ্রীষ্মকালের ধান— এই ধান অনাবৃষ্টির সময়ে জন্মায়। এইজন্য খুব নিচু জমিতে যেখানে সাধারণত জল একেবারে শুকাইয়া যায় না, সেইরকম জমিতে এই ধানের চাষ হয়। কার্তিক মাসে বীজতলায় বীজ বুনিয়া পৌষ মাঘ মাসে নদীতীরবর্তী বা বিল-জমিতে জল সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাদার উপরে এই ধানের চারা রোপণ করা হয় এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে ইহার ফসল কাটা হয়।

এই পাঁচ শ্রেণীর ধানের প্রত্যেকটির মধ্যে বহু জাতের ধান আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ধানের চাষ হওয়া সত্ত্বেও এদেশে যে ধান উৎপন্ন হয় তাহা দেশের পক্ষে যথেষ্ট নহে। শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ ধানের জন্য বাংলাকে ব্রহ্মদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়।

১৯৪২-৪৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষে মোট ৭২,২৭,৭০০০ একর জমিতে ধান উৎপন্ন করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় ২২,০০,০০০০ একর, মান্দ্রাজ প্রায় ১০,৫০,০০০০ একর, বিহারে ৯,৫০,০০০০ একর, যুক্ত প্রদেশে ৭,০০,০০০০ একর এবং মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও আসামের প্রত্যেক প্রদেশে প্রায় ৫,০০,০০০০ একর জমিতে ধান জন্মানো হয়। এখানে বলা যাইতে পারে যে সেই বছরে ভারতবর্ষে মোট ২১,৮৫০,০০০ টন্ চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল।

সম্প্রতি যে মহাযুদ্ধের অবসান হইল তাহার পূর্বে ভারতবর্ষে প্রতিবছর প্রায় ২০ হইতে ৩০ লক্ষ মন ধান আমদানি হইত। এর মধ্যে বেশির ভাগই ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানি হইত। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মধ্যে বাংলাদেশই আমদানি ধানের উপর সর্বাপেক্ষা নির্ভরশীল ছিল। বিগত মহাযুদ্ধের প্রথমে যখন ব্রহ্মদেশ প্রথম জাপানীদের দখলে যায় সেইসময়ে বাংলাদেশে ধানের যে ঘাট্‌তি ছিল তা প্রতিপন্ন হয়। বাংলাদেশের অনেক জায়গাতে চাউল দুর্মূল্য হয় এবং ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগে বাংলাদেশে কোনো কোনো

জায়গাতে ৫০৲ হইতে ১০০৲ টাকা মনদরেও চাউল বিক্রি হইয়াছে। চাউলের অভাবে এ সময়ে বাংলাদেশে যে দুর্ভিক্ষের বন্যা বহিয়া গিয়াছে তাহা যাহারা নিজের চোখে দেখে নাই তাহাদের পক্ষে উপলব্ধি করা অসম্ভব।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বাংলাদেশের ধানের জমি ও উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ বুঝা যাইবে।

বাংলাদেশের ধানের জমি ও উৎপন্ন চাউল

খ্রীস্টাব্দ	ধানের জমি	উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ
১৯১৬-১৭	২,১১,২২,৫০১ একর	২৪,৯০,০০,০০০মন
১৯৩৬-৩৭	২,১৯,৩৩,০০০ একর	২৪,৯৭,০৩,০০০মন

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে বাংলাদেশে ধানের জমি ও উৎপন্ন জমির পরিমাণ আদৌ বৃদ্ধি পায় নাই। কিন্তু বাংলার জনসংখ্যা যে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা নিম্নের জনসংখ্যা-তালিকা হইতে বেশ বুঝা যাইবে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

খ্রীস্টাব্দ	জনসংখ্যা	প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা
১৯০১	৪,২৮,৮৮,১৯৪	৫৪৮
১৯১১	৪,৬৩,৯২,২৬২	৫৯৩
১৯২১	৪,৭৫,৯৯,২৩৩	৬০৭
১৯৩১	৫,১০,৮৭,৩৩৮	৬৫৭
১৯৪১	৬,১৪,৬০,৩৭৭	৭৪০

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এক বর্গমাইল ২৫০ জনের অধিক লোকের পক্ষে যথেষ্ট নহে। বর্তমানে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা ৭৪০— কাজেই বাংলার কৃষিজাত পদার্থ বাঙালির খাদ্যের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র সরবরাহ করে বলা যাইতে পারে। বাংলাদেশে চাউলের অভাব নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বোঝা যায় :

বাংলাদেশে চাউলের অভাব

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের জনসংখ্যা	প্রতিবৎসর উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ১৯৩২-৩৩ হইতে ১৯৩৬-৩৭ গড়পড়তা	প্রতিবৎসর আহারের জন্য চাউলের পরিমাণ	কম চাউলের পরিমাণ
৬,১৪,৬০,৩৭৭	২৪,৬৪,৮৩,৯৮৮ মন	৩৩,২৮,৩৯,৩৩৫ মন	৮,৬৩,৫৫,৩৪৭ মন

উপরের তালিকার অঙ্কে অনুমান করা হইয়াছে বাংলাদেশে সকলেই দুই বেলা ভাত খায়। কিন্তু যদি আমরা হিসাবে ধরি যে ৫০ লক্ষ হিন্দু বিধবা এক বেলা ভাত খান, ২৫ লক্ষ অবাঙালী ও বাঙালী গম খায় এবং শতকরা ৮ জন লোক বৎসরে রোগে আক্রান্ত হয় তাহা হইলে উল্লিখিত হিসাব হইতে ৫,১৯,২০,২১৭ মন বাদ দিতে হয়। তবে যদি বীজের জন্য ১,০০,০০,০০০ মন ধান এবং চিড়া, মুড়ি, খৈ প্রভৃতি খাদ্যের জন্য আরও ২,০০,০০,০০০ মন ধানের হিসাব ধরা যায় তাহা হইলে প্রতিবৎসর ৬,৪৪ ৩৫,১৩০ মন চাউলের অভাব হয় বলা যাইতে পারে। উৎপন্ন ধানের পরিমাণ বাড়াইবার উপায় হইতেছে ধানের জন্য চাষের জমি বাড়ানো এবং নীরোগ বীজ ব্যবহার করিয়া উপযুক্ত সারের বিশেষ করিয়া অ্যামোনিয়ম সালফেটের সাহায্যে জমির উৎপাদিকা-শক্তি বাড়ানো। তাহা ছাড়া ফসলের জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে জলসেচন ও

জলনিকাশের ব্যবস্থা করা উচিত। দেশের লোককে পেট ভরিয়া খাওয়াইবার জন্য খরচ যাহাই লাগুক না কেন, গভর্মেণ্টের সে বিষয়ে তৎপর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অধিকতর ফসল ও সবজি উৎপাদনের চেষ্টা

গত দুই বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশে যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে, খাদ্যাভাবই তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ এবং এই অবস্থার একমাত্র প্রতিকার হইতেছে বেশি করিয়া খাদ্য উৎপাদন দ্বারা বর্তমান খাদ্যের অভাব দূর করা। ১৯৪২-৪৩ সালের প্রথমে বাংলা গভর্মেণ্ট দেশব্যাপী খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো আন্দোলন শুরু করিয়াছেন এবং দেশবাসীর সকলের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন যতটা বাড়ানো দরকার তা বাড়ে নাই। বাংলাসরকারের কৃষিবিভাগ উন্নত বীজ, সার ও কৃষি যন্ত্রাদি সরবরাহ করিয়া চাষীদের বেশি ফসল উৎপাদনে সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু একটা বড়ো পরিবর্তন বা উন্নতি শুধু গভর্মেণ্টের চেষ্টার দ্বারা সম্পূর্ণ সফল হয় না। দেশের জনসাধারণের আন্তরিক চেষ্টাও দরকার। বাংলার শহর অঞ্চলের কথা বাদ দিলেও গ্রাম অঞ্চলে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক গৃহস্থেরই ঘরের সংলগ্ন কিছু না কিছু জমি থাকে। এই সব জমিতে এখন বিশেষ কিছু উৎপন্ন হয় না। বাংলার প্রত্যেক গৃহস্থ যদি সুযোগ ও সম্ভাবনামতো নিজ নিজ গৃহ-সংলগ্ন জমিতে ফসল বা সবজি উৎপাদন করেন—তাহা হইলে বাংলাদেশে কখনো খাদ্যাভাব ঘটিতে পারে না।

ভারতের কৃষির উন্নতির চেষ্টা

ভারত সরকার বহুদিন হইতে পাশ্চাত্য প্রণালী ব্যবহার করিয়া কৃষিকার্যের উন্নতির চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে তুলা জন্মাইবার জন্য আমেরিকা হইতে বারো জন বিশেষজ্ঞকে

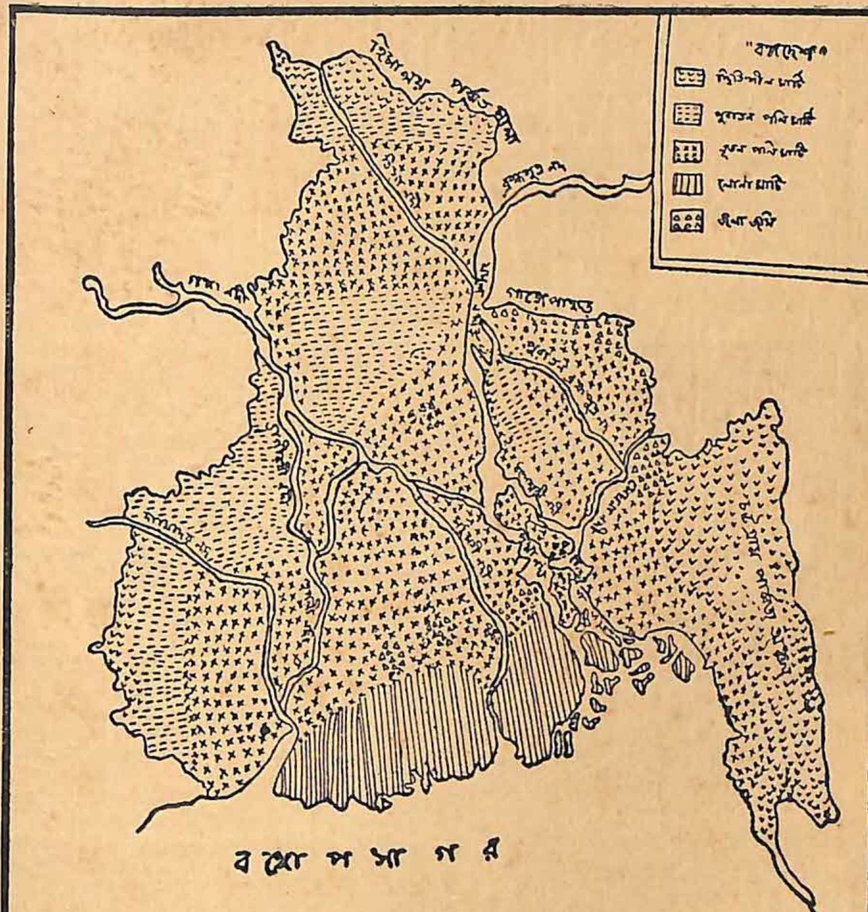
ভারতবর্ষে আনেন। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে জমি চাষ করিবার জন্য মান্দ্রাজ গভর্মেণ্ট বাষ্পশক্তি দ্বারা পরিচালিত লাঙ্গল এবং অন্যান্য বহুবিধ কৃষিযন্ত্র বিদেশ হইতে আমদানি করেন। দুঃখের বিষয় কৃষিকার্যের উন্নতির এই সকল প্রয়াস বিশেষ সফল হয় নাই। বহু আলোচনা ও চিন্তার ফলে বোঝা গেল যে শুধু পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসরণ করিয়া এদেশের কৃষির উন্নতির সম্ভাবনা খুব কম। এদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষিপ্রণালীর উদ্ভাবন করা আবশ্যক। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিবার জন্য একটি দুর্ভিক্ষ কমিশন (Famine Commission) নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণ করার প্রণালী সম্বন্ধে সুপারিশ করা। ভারতীয় কৃষিকার্যের উন্নতি সম্বন্ধে সর্বপ্রথম এই কমিশনই বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং ইহার নির্দেশ অনুযায়ী কয়েক বৎসর পরেই কিছু কিছু কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে ডক্টর ভয়েলকারকে (Dr. Voelcker) ভারত সরকার কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া আনেন। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে মিঃ জেমস মলিসন্‌কে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী বিভাগের কৃষিকার্যের যন্ত্র সম্বন্ধে সহকারী অধ্যক্ষ (Technical Deputy Director of Agriculture) নিযুক্ত করা হয়। ইনিই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে শস্যোৎপাদন আরম্ভ করেন। এই সময়ে ডক্টর জে. ডব্লিউ. লেদার কৃষিপ্রণালীর উন্নতির জন্য ভারত সরকারের কৃষিরসায়নবিদের পদে নিযুক্ত হন। সেই সময়ে কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতি সাধন কৃষি-রসায়নবিদ্‌গণের কার্য বলিয়া গণ্য হইত। ক্রমে ভারতের কর্তৃপক্ষ কৃষিকার্যে অন্যান্য বিষয়ের গুরুত্বও বেশ বুঝিতে পারিলেন। মাদ্রাজ প্রদেশে আখের ব্যাধি চাষীদের বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছিল এবং এই ব্যাধি নিবারণের জন্য ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ওয়েস্ট ইণ্ডিস্‌ হইতে ডক্টর বার্‌বার্‌কে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। এই প্রবীণ বিশেষজ্ঞের পরীক্ষার ফলে ভারতের কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে সমস্ত

চিন্তার ধারা বহু বৎসর যাবত উদ্ভিদ প্রজনন ও নীরোগ বীজ ব্যবহারের দিকে প্রসারিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে বুঝা গেল যে, কৃষির উন্নতির জন্ত রসায়ন ছাড়াও অন্যান্য বিজ্ঞানের ব্যবহার অপরিহার্য।

১৯০১ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার আর একটি দুর্ভিক্ষ কমিশন নিযুক্ত করেন। এই দ্বিতীয় কমিশনের সুপারিশ অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া সরকারী কৃষিবিভাগ স্থাপিত হয়। ভারতের নানাস্থানে পরীক্ষা এবং গবেষণার দ্বারা কৃষির উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। কয়েকটি প্রদেশে যুবকদিগকে কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য সরকারী স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া পুষাতে একটি কেন্দ্রীয় কৃষিগবেষণাগার স্থাপিত হয়। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকারে কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে আইন পাস করেন তাহাতে কৃষির উন্নতির জন্য প্রাদেশিক কৃষিবিভাগকে দায়ী করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় গভর্মেণ্টকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতের কৃষির উন্নতি সাধন করিবার জন্য একটি রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত হন। ভারতীয় পল্লীজীবনে এই রাজকীয় কমিশনের সুপারিশের ফলে একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছিল। কমিশনের সদস্যগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন করিতে হইলে ভারতের পল্লীজীবনের উন্নতি সাধন করা দরকার। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে রাজকীয় কমিশন একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। ভারতের কৃষিকার্য সম্বন্ধে এযাবত যত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার মধ্যে এই রিপোর্টই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই রিপোর্টের সুপারিশের ফলে ভারতীয় কৃষি-গবেষণা-পরিষদ (Imperial Council of Agricultural Research) স্থাপিত হইয়াছে। এই পরিষদের উদ্দেশ্য হইতেছে প্রাদেশিক কৃষিবিভাগে হস্তক্ষেপ না করিয়া কৃষির উন্নতির জন্য গবেষণায় প্রেরণা দেওয়া এবং সাহায্য করা। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতসরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া সার জন রাসেল

ও ডক্টর এন. সি. রাইট ভারতবর্ষের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং কৃষি-গবেষণা-পরিষদের কার্যাবলী সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়া রিপোর্ট দাখিল করেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কৃষকেরাই ভারতবর্ষের মেরুদণ্ডস্বরূপ। তাঁহারা স্পষ্টভাবে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন করিতে হইলে প্রথমেই পল্লীগুলির উন্নতি সাধন করা দরকার। আমাদের দেশের কৃষকেরা চিরকাল যে প্রণালীতে কৃষিকার্য করিয়া আসিতেছে,— তাহার কিছুমাত্র অদলবদল করিতে একেবারেই রাজি নয়। ইহার কারণ পল্লীগ্রামে শিক্ষার অভাব। যাহাতে কৃষকেরা কৃষিকার্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ব্যবহার বুঝিয়া তাহা নিজেরা প্রয়োগ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। প্রাদেশিক কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা দেশের কৃষকের সংখ্যার তুলনায় নিতান্ত সামান্য।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যে সকল কৃষি-শিক্ষাগার আছে তাহাদের মধ্যে পুনা, কোয়েম্বাটোর, লায়ালপুর, নাগপুর, কানপুর, এলাহাবাদ ও ঢাকার কৃষি-শিক্ষাগারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল শিক্ষাগারে উচ্চ কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া নানা স্থানে মাধ্যমিক কৃষি-বিদ্যালয় আছে। ঢাকা ও চুঁচুঁড়ার মাধ্যমিক কৃষি-বিদ্যালয়ের নাম বলা যাইতে পারে। দৌলতপুরের কৃষি-পরিষদে এবং রাজসাহীর 'বসন্তকুমার কৃষি-পরিষদে' প্রতি বৎসর কয়েকজন যুবক কৃষিকার্যে সরকারী ডিপ্লোমা লাভ করিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষামূলক কৃষিকার্য বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য বারাকপুরে একটি কৃষিশিক্ষাগার স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকের সংখ্যা ও চাষের জমির অনুপাতে এই কয়েকটি শিক্ষাগার যথেষ্ট নহে।


"বঙ্গদেশ"
পুরাতন পলি মাটি
নূতন পলি মাটি
লোনা মাটি
হিমালয় পর্বতমালা
গারো পাহাড়
বঙ্গোপসাগর